সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী

ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি

ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ : মুহাম্মদ আবদুর রহীম

আধুনিক প্রকাশনী

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৮৮২-৩৮৮০৮৭, ০১৮৭৫-২৪৬৪৫৫
www . adhunikprokashoni.com
Email : adhunikprokashoni@yahoo.com
facebook.com/ adhunikprokashoni

আঃ প্রঃ ১২২

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৭

৩৯শ প্রকাশ
জুমাদাল আখিরাহ ১৪৪৬
অগ্রহায়ণ ১৪৩১
ডিসেম্বর ২০২৪

বিনিময় : ৪৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

تحريك اسلامى كى اخلاقى بنيادى-এর বঙ্গানুবাদ

ISLAMI ANDOLONER NAYTIK BHITTI by Sayyid Abul A'la Mawdoodi. Published by Adhunik Prokashani, 25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bnagladesh Islamic Institute, 25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 45.00 Only.

"ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি" বইটি ১৯৪৫ সালের ২১ এপ্রিল পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠান কোটস্থ দারুল ইসলামে মরহুম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.-এর একটি বক্তৃতার গ্রন্থরূপ।

এ বইটিতে নৈতিকতার মূল ভিত্তি সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় বিধায় বইটি আমরা আবারো প্রকাশ করলাম। এর দ্বারা পাঠকগণ উপকৃত হলে আশা আছে আখিরাতে আমরাও কিছু উপকৃত হবো।

– প্রকাশক

সূচীপত্র

❖ ইসলামী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ---------------------------- ৫
❖ নেতৃত্বের গুরুত্ব -- ৭
❖ সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা দীন ইসলামের মূল লক্ষ্য ----------------- ১০
❖ নেতৃত্বের ব্যাপারে আল্লাহর নিয়ম --------------------------- ১৪
❖ মানুষের উত্থান-পতন নৈতিক চরিত্রের উপর নির্ভরশীল --------- ১৬
❖ মৌলিক মানবীয় চরিত্রের বিশ্লেষণ --------------------------- ১৮
❖ ইসলামী নৈতিকতা -- ২১
❖ নেতৃত্ব সম্পর্কে আল্লাহর নীতির সারকথা ------------------- ২৫
❖ মৌলিক মানবীয় চরিত্র ও ইসলামী নৈতিক শক্তির তারতম্য ------ ২৭
❖ ইসলামী নৈতিকতার চার পর্যায় ----------------------------- ৩৪
❖ ভুল ধারণার অপনোদন -------------------------------------- ৫০

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য

আপনারা জানেন, ইসলামী আন্দোলনের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে নেতৃত্বের আমূল পরিবর্তন। এই দুনিয়াতে আমরা যে লক্ষ্যে উপনীত হতে চাই, তা এই যে, মানব জীবনের সর্বক্ষেত্র হতে ফাসেক, আল্লাহদ্রোহী ও পাপীষ্ঠ লোকদের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য নির্মূল করে দিয়ে তদস্থলে আমরা সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করবো। এই উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রাম করাকে আমরা ইহকাল ও পরকাল সর্বত্রই আল্লাহর সন্তোষলাভের একমাত্র উপায় বলে বিশ্বাস করি।

কিন্তু আমরা যে জিনিসকে নিজেদের চরম উদ্দেশ্য হিসেবে নির্দিষ্ট করে নিয়েছি, বর্তমান মুসলিম-অমুসলিম কেউ-ই এর গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্ণরূপে সচেতন ও অবহিত নয়। মুসলমানগণ একে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মাত্র বলে মনে করে। দীন ইসলামে এর গুরুত্ব যে কতোখানি, তা তারা মাত্র অনুধাবন করতে সমর্থ হয় না। অমুসলিমগণ কিছুটা হিংসার বশবর্তী এবং অনেকটা অজ্ঞতাবশত মানব সমাজের মূলগত সমস্যা সম্পর্কে একেবারেই অচেতন হয়ে আছে। এই দুনিয়ায় মানব সমাজের সকল দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদ-মুসিবতের মূলীভূত কারণ হচ্ছে মানুষের উপর ফাসেক, আল্লাহদ্রোহী, পাপী ও অসৎলোকদের নেতৃত্ব। পৃথিবীর সর্বাধিক কাজ-কর্মের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব কেবলমাত্র সৎ ও আল্লাহর অনুগত লোকদের হাতে ন্যস্ত হওয়ার উপরই মানবতার কল্যাণ একান্তভাবে নির্ভর করে। কিন্তু বর্তমানে মানুষ এই কথা মাত্রই হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে না। আজ বিশ্বের মানব সমাজে যে মহাবিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে, অত্যাচার-যুলুম ও নির্যাতন-নিষ্পেষণের সর্বপ্লাবী সয়লাব বয়ে চলছে, মানব চরিত্রে যে সর্বাত্মক ভাঙন ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, মানবীয় সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে বিষ সংক্রমিত হয়েছে, পৃথিবীর যাবতীয় উপায়-উপাদান এবং মানব বুদ্ধির আবিষ্কৃত সমগ্র শক্তি ও যন্ত্র যেভাবে মানুষের কল্যাণ ও উন্নতি বিধানের পরিবর্তে ধ্বংস সাধনের কাজে নিয়োজিত হচ্ছে– এসবের জন্য মানব সমাজের বর্তমান নেতৃত্বই যে

একমাত্র দায়ী, তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। দুনিয়াতে সৎ ও সত্যপ্রিয় লোকদের কোনো অভাব নেই একথা ঠিক, কিন্তু দুনিয়ার যাবতীয় কাজ-কর্মের কর্তৃত্ব এবং সমাজযন্ত্রের কোনো চাবিকাঠি তাদের হাতে নেই, এটি স্বতঃসিদ্ধ। বরং বর্তমান দুনিয়ার সর্বত্রই কর্তৃত্ব রয়েছে আল্লাহদ্রোহী, আল্লাহবিমুখ, জড়বাদী ও নৈতিক চরিত্রহীন লোকদের মুষ্টিতে। এমতাবস্থায় যদি কেউ দুনিয়ার সংস্কার-সংশোধন করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয় এবং বিপর্যয়, উচ্ছৃঙ্খলা, অশান্তি, অসচ্চরিত্রতা এবং অন্যায়কে পরিবর্তত করে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং সুসংবদ্ধতা-সচ্চরিত্রতা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টানুবর্তী হয়, তবে পুণ্য ও সওয়াবের ওয়াজ, আল্লাহর বন্দেগী করার সদুপদেশ, সচ্চরিত্রতা, নির্মল নৈতিকতা গ্রহণের মৌখিক উৎসাহ দেওয়াই কখনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যথেষ্ট হতে পারে না। বরং মনুষ্য জাতির মধ্যে সত্যপ্রিয় ও ন্যায়পন্থী যতো লোকই পাওয়া যাবে, তাদের একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করে সমষ্টিগত শক্তি অর্জন করা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব ফাসেক ও আল্লাহদ্রোহী লোকদের হাত থেকে কেড়ে সত্যপন্থী ও আদর্শবাদী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করাই সংস্কারবাদী প্রত্যেকটি মানুষের পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে পড়ে।

নেতৃত্বের গুরুত্ব

মানব জীবনের জটিল সমস্যাবলি সম্পর্কে সামান্যমাত্র জ্ঞানও যার আছে, এই নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে সে ভালো করেই অবহিত হবে যে, মানব সমাজের যাবতীয় ব্যাপারে কর্তৃত্ব ও চাবিকাঠি কার হাতে নিবদ্ধ– এই প্রশ্নের উপরই মানব জীবনের শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা এবং ভাঙন-বিপর্যয় ও অধঃপতন একান্তভাবে নির্ভর করে। গাড়ি যেমন সবসময়ই সেই দিকে দৌড়িয়ে থাকে যেদিকে তার পরিচালক ড্রাইভার চালিয়ে নেয় এবং তার আরোহীগণ ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক সেই দিকেই ভ্রমণ করতে বাধ্য হয়; অনুরূপভাবে মানব সমাজের গাড়িও ঠিক সেই দিকেই অগ্রসর হয়ে থাকে যেদিকে তার নেতৃবৃন্দ ও কর্তৃত্বশীল লোকেরা নিয়ে যায়। পৃথিবীর সমগ্র উপায়-উপাদান যাদের করায়ত্ব হয়ে থাকবে; শক্তি, ক্ষমতা ইখতিয়ারের সব চাবিকাঠি যাদের মুঠির মধ্যে থাকবে, সাধারণ জনগণের জীবন যাদের হাতে নিবদ্ধ হবে, চিন্তাধারা, মতবাদ ও আদর্শের রূপায়ণ বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য উপায়-উপাদান যাদের অর্জিত হবে, ব্যক্তিগত স্বভাব-চরিত্র পুনর্গঠন, সমষ্টিগত নীতি ব্যবস্থার বাস্তবায়ন এবং নৈতিক মূল্য (Value) নির্ধারণের ক্ষমতা যাদের রয়েছে, তাদের অধীন জীবনযাপনকারী লোকগণ সমষ্টিগতভাবে তার বিপরীত দিকে কিছুতেই চলতে পারে না। এই নেতৃবৃন্দ ও কর্তৃত্বশীল লোকগণ যদি আল্লাহর অনুগামী, সৎ ও সত্যাশ্রয়ী হয়, তবে সেই সমাজের লোকদের জীবনের সমগ্র গ্রন্থী ও ব্যবস্থাই আল্লাহভীতি, সার্বিক কল্যাণ ও ব্যাপক সত্যের উপর গড়ে উঠবে। অসৎ ও পাপী লোকও সেখানে সৎ ও পুণ্যবান হতে বাধ্য হবে। কল্যাণ ও সৎ ব্যবস্থা এবং কল্যাণকর রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, উৎকর্ষ ও বিকাশ লাভ করবে। অন্যায় এবং পাপ নিঃশেষে মিটে না গেলেও অন্তত তা উন্নতিশীল এবং বিকশিত হতে পারবে না। কিন্তু নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যদি আল্লাহদ্রোহী, ফাসেক, পাপী ও পাপলিপ্সু লোকদের করায়ত্ত হয়, তবে গোটা জীবনব্যবস্থায়ই স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহদ্রোহিতা, যুলুম, অন্যায়, অনাচার ও অসচ্চরিত্রতার পথে চলতে শুরু করবে। চিন্তাধারা আদর্শ ও মতবাদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্প রাজনীতি, অর্থনীতি, সভ্যতা, সংস্কৃতি,

সামাজিক, রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান, নৈতিক চরিত্র ও পারস্পরিক কাজকর্ম, বিচার ও আইন সমষ্টিগতভাবে এ সবকিছুই বিপর্যস্ত হবে। অন্যায় ও পাপ ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে। কল্যাণ, ন্যায় ও সত্য পৃথিবীর কোথাও একবিন্দু খুঁজে পাওয়া যাবে না। পৃথিবী ন্যায় ও সত্যকে স্থান দিতে, বায়ু ও পানি তার লালন-পালন করতে অস্বীকার করবে। আল্লাহর এই পৃথিবী অত্যাচার, যুলুম, শোষণ ও নিপীড়ন-নিষ্পেষণের সয়লাভ স্রোতে কানায় কানায় ভরে যাবে। এরূপ পরিবেশে অন্যায়ের পথে চলা সকলের পক্ষেই সহজ হবে-ন্যায় ও সত্যের পথে চলাচল নয় শুধু দাঁড়িয়ে থাকাও হবে অত্যন্ত কঠিন। একটি জনাকীর্ণ মিছিলের সমগ্র জনতা যেদিকে চলে সেদিকে চলার জন্য উক্ত মিছিলের অন্তর্ভুক্ত কোনো ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ শক্তি ব্যয় করতে হয় না, ভিড়ের চাপেই সে স্বতঃই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, কিন্তু তার বিপরীত দিকে চলার জন্য প্রবল শক্তি ব্যয় করে এক কদম পরিমাণ স্থান অগ্রসর হওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় বিপরীত দিকে সামান্য চললেও ভিড়ের প্রবল ও অপ্রতিরোধ্য চাপে দশ কদম পশ্চাতে সরে পড়তে বাধ্য হয়-এটা এক স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত সত্য। মানুষের সমষ্টিগত জীবনের ধারা যখন অসৎ ও পাপাশ্রয়ী লোকদের নেতৃত্বে কুফরী ও ফাসেকী পথে অগ্রসর হতে থাকে, তখন (উপরোক্ত উদাহরণের ন্যায়) স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্তিদের পক্ষে অন্যায়ের পথে চলা তো খুবই সহজ-এতোই সহজ হয় যে, সেদিকে চলার জন্য নিজের কোনো শক্তি ব্যয় করতেই হয় না। কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলতে চাইলে নিজের দেহ-মনের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করেও তার পক্ষে ন্যায় পথে দৃঢ় হয়ে থাকতে পারলেও সমষ্টিগতভাবে তার জীবন মানব সমষ্টির অনিবার্য চাপে পাপ ও অন্যায়ের পথেই চলতে বাধ্য হয়।

এখানে আমি যা বলছি তা এমন কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নয়, যার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য কোনো যুক্তিতর্কের আবশ্যক হতে পারে। বাস্তব ঘটনা প্রবাহই একে অনস্বীকার্য সত্যে পরিণত করেছে। কোনো সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিই এর সত্যতা স্বীকার না করে পারে না। এই বইয়ের প্রত্যেক পাঠকই আমার উক্ত কথার সত্যতা যাচাই করতে পারে।

বিগত এক শতাব্দীকালের মধ্যে আমাদের এই দেশের লোকদের মতবাদ, চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গী, রুচি ও স্বভাব-প্রকৃতি, চিন্তা-পদ্ধতি ও দৃষ্টিকোণ গভীরভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, সভ্যতা ও চরিত্রের মানদণ্ড এবং মূল্য ও গুরুত্বের মাপকাঠি বদলে গেছে। আমাদের একটি জিনিসও অপরিবর্তিত

থাকতে পারে নি। এই বিরাট পরিবর্তন আমাদের এই দেশে আমাদেরই দৃষ্টি সম্মুখে সাধিত হলো। মূলত এর কি কারণ হতে পারে, তা কি একবারও ভেবে দেখেছেন? আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, এর একটি মাত্র কারণ রয়েছে, আর আপনি যতোই চিন্তা করেন, এছাড়া অন্য কোনো কারণ নির্ধারণ করা আপনার পক্ষেও সম্ভব হবে না। সে কারণ শুধু এটাই যে, যে সকল লোকের হাতে এদেশের সর্বময় কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব নিবদ্ধ ছিলো, সমাজ পরিচালনা ও দেশ শাসনের ক্ষমতা ইখতিয়ার যাদের করায়ত্ত ছিলো, তারাই সমগ্র দেশের নৈতিক চরিত্র, মনোবৃত্তি, মনস্তত্ব, কাজকর্ম ও পারস্পরিক লেন-দেন ও আদান-প্রদান এবং সমাজ-সংস্থা ও ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারেই ঢেলে গঠন করেছিলো। এই পরিবর্তনের বিরোধিতা করার জন্য যেসব শক্তি মস্তক উত্তোলন করেছিলো, তারা কতোখানি সাফল্য লাভ করতে পেরেছে, আর ব্যর্থতা তাদেরকে কতোখানি অভিনন্দিত করেছে, তাও একবার গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন।

একথা কি সত্য নয় যে, পরিবর্তন বিরোধী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে যারা নেতৃত্ব দান করেছেন, তাঁদেরই সন্তান অধঃস্তন পুরুষ শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন স্রোতের গড্ডালিকা প্রবাহে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভেসে গেছে? বহির্বিশ্বের যাবতীয় বিবর্তিত রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও ধরন-পদ্ধতি সবকিছুই তাদের ঘরবাড়ি নিমজ্জিত করে দিয়েছে? এটা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে যে, অসংখ্য সম্মানিত ধর্ম নেতার বংশে আজ এমন সকল লোকের জন্ম হচ্ছে, যারা আল্লাহর অস্তিত্ব এবং অহী ও নবুয়াতের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রবল সন্দেহ পোষণ করছে? জাতীয় জীবনের এই বিরাট বিপর্যয় এই বাস্তব পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার পরও কি একথা অস্বীকার করা যায় যে, মানব জীবনের অসংখ্য সমস্যার মধ্যে নেতৃত্বের সমস্যাই হচ্ছে সবচেয়ে জটিল এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর সত্য কথা এই যে, এই জিনিসটির এহেন গুরুত্ব কেবল বর্তমানেই তীব্র হয়ে দেখা দেয় নি, এটা এক চিরন্তন সত্য ও চিরকালীন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

اَلنَّاسُ عَلٰى دِيْنِ مُلُوْكِهِمْ "জনগণ নেতৃবৃন্দেরই আদর্শানুসারী হয়ে থাকে" কথাটি বহু পুরাতন। হাদিসে জাতীয় উত্থান-পতন, গঠন ও ভাঙনের জন্য দায়ী করা হয়েছে জাতিসমূহের আলেম, পণ্ডিত, শিক্ষিত লোক এবং নেতৃবৃন্দকে। কারণ সমাজের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও পথপ্রদর্শনের গুরুদায়িত্ব চিরদিনই এদের উপর অর্পিত হয়ে থাকে।

সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা দীন ইসলামের মূল লক্ষ্য

সৎ ও আদর্শ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা দীন ইসলামে যে কতোবেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ হতে খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারা যায়। আল্লাহ প্রদত্ত দীন ইসলামের সর্বপ্রথম নির্দেশ এই যে—

১. দুনিয়ার সকল মানুষ নিরঙ্কুশভাবে একমাত্র আল্লাহর দাস হয়ে জীবন-যাপন করবে এবং তাদের গলায় আল্লাহর দাসত্ব ছাড়া অন্য কারো দাসত্বের শৃঙ্খল থাকবে না।

২. সেই সঙ্গেই এর আর একটি দাবি এই যে, আল্লাহর দেওয়া আইনকেই মানুষের জীবনের একমাত্র আইন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

৩. এর তৃতীয় দাবি এই যে, পৃথিবীর বুক হতে সব অশান্তি ও বিপর্যয় নির্মূল করতে হবে, পাপ ও অন্যায়ের মূলোৎপাটন করতে হবে। যেহেতু দুনিয়ার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হওয়ার এটাই একমাত্র কারণ।

অতএব এসব দূরীভূত করে তদস্থলে ন্যায়, সত্য ও কল্যাণকর ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও উৎকর্ষ সাধন করতে হবে, কারণ আল্লাহ তা'আলা এটাই পছন্দ করেন এবং ভালোবাসেন। কিন্তু সকলেই বুঝতে পারেন যে, মনুষ্য জাতির নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং যাবতীয় সামাজিক কার্যাবলির মূল চাবিকাঠি যতোদিন কাফের ও ভ্রষ্ট নেতৃবৃন্দের মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে থাকবে; আর একমাত্র সত্যব্যবস্থা ইসলামের অনুসারী যতোদিন তাদের অধীন, তাদেরই প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগে লিপ্ত হয়ে ঘরের কোণে বসে আল্লাহর 'যিক্র' করার কাজে নিমগ্ন হয়ে থাকবে ততোদিন উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য কখনোই সফল হতে পারে না। এই লক্ষ্য স্বতঃই নেতৃত্বের আমূল পরিবর্তন দাবি করে এবং সকল ন্যায়নিষ্ঠ, ন্যায়পন্থী, আল্লাহর সন্তোষকামী লোকদেরকে পরস্পর মিলিত হয়ে সামগ্রিক শক্তি অর্জন করতে এবং সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করে আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র সত্য বিধান ইসলামকে কায়েম করতে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয়। এই সত্য বিধান কায়েম করতে হলে নেতৃত্বের পদ ও কর্তৃত্বের সমস্ত চাবিকাঠি সমাজের সর্বাপেক্ষা অধিক ঈমানদার, সৎ ও আদর্শবাদী লোকের হাতে অর্পণ করতে হবে। এরূপ রাষ্ট্র বিপ্লব সাধন

ছাড়া দীন ইসলামের মূল লক্ষ্য এবং দাবি কখনোই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এ জন্যই সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা দীন ইসলামের সত্য বিধান বাস্তবায়নে আল্লাহ প্রদত্ত ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছে। এমনকি এই বিরাট কর্তব্য বিস্মৃত হওয়ার পর এমন কোনো কাজই থাকতে পারে না, যা করে আল্লাহর কিছুমাত্র সন্তোষ লাভ করা সম্ভব হতে পারে। কুরআন মজীদে জামায়াতবদ্ধ হওয়া ও নেতার আদেশ শ্রবণ ও পালনের উপর এতোবেশি গুরুত্ব কেনো আরোপ করা হয়েছে, তা বাস্তবিকই প্রণিধানযোগ্য। উপরন্তু কুরআনের বিধান মতে জামায়াত হতে স্বেচ্ছায় বহিষ্কৃত ব্যক্তি চূড়ান্ত শাস্তির যোগ্য। তাওহীদের কালেমায় তার বিশ্বাস থাকলেও এবং নামায-রোযা পালনকারী হলেও এই দণ্ড হতে সে কোনোক্রমেই রক্ষা পেতে পারে না। এরই বা কারণ কী? এর মূল ও একমাত্র কারণ কি এই নয় যে, সৎ নেতৃত্ব ও সত্যের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও স্থিতি সাধন দীন ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলেই এরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? আর এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য সমষ্টিগত ও সংঘবদ্ধ শক্তি অর্জন করা একান্ত অপরিহার্য। কাজেই যে ব্যক্তিই সামগ্রিক শক্তি ও সামাজিক শৃঙ্খলা চূর্ণ করবে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

পরন্তু, ইসলামে জিহাদের উপর এতো অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে কেনো, তাও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। জিহাদ হতে বিরত থাকলে কুরআন মাজিদ তাকে 'মুনাফিক' বলে কেনো অভিহিত করে? কারণ এই যে, জিহাদ ইসলামের সত্য বিধান প্রতিষ্ঠারই নামান্তর মাত্র, কুরআন মাজীদে মুসলমানের ঈমান পরীক্ষার জন্য এই জিহাদকেই চূড়ান্ত মাপকাঠি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অন্য কথায় কুরআনের বিধান অনুযায়ী ঈমানদার ব্যক্তি বাতিল ও কাফেরী শাসন ব্যবস্থার প্রাধান্যে কখনোই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। আর দীন ইসলামের সত্য ও আদর্শ জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা-সাধনা না করা এবং জান-মালের কুরবানী না দেওয়া তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। আর এই কাজে এ ব্যাপারে কারো কুণ্ঠা ও ইতস্ততভাব প্রকাশিত হলে তার ঈমান সংশয়ের মধ্যে পড়ে যায়। ফলে অন্য হাজার 'সওয়াবের' কাজও তাকে কোনো কল্যাণ দান করতে সমর্থ হয় না।

এই বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করার স্থান এটা নয়, এখানে তার অবকাশও নেই; কিন্তু উপরে যা কিছু বলেছি তা হতে খুব সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা একটি

কেন্দ্রীয় ও মৌলিক উদ্দেশ্য বিশেষ এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এই ইসলামের প্রতি যার ঈমান আছে একমাত্র নিজের ব্যক্তিগত জীবনকেই যথাসম্ভব ইসলামী আদর্শের অনুসারী করলে তার সব কর্তব্য সম্পন্ন হয় না–তার সকল দায়িত্ব পালন হয় না। মানব সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকার কাফের ও ফাসেকদের নিকট হতে কেড়ে নিয়ে সর্বাপেক্ষা সৎ, সত্যাশ্রয়ী ও আদর্শবাদী লোকদের হাতে তা তুলে দেওয়ার জন্য সর্বশক্তি নিযুক্ত করাও তার মূল ঈমানের ঐকান্তিক ও অনস্বীকার্য দাবি। কারণ, আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা ও সমাজ পরিচালনা এরূপ এক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ভিন্ন আদৌ সম্ভব নয়।

পরন্তু, এই উদ্দেশ্য যেহেতু উচ্চতর সামগ্রিক প্রচেষ্টা ছাড়া হাসিল হতে পারে না, এজন্যই এমন একটি সৎ ও আদর্শ জামায়াত গঠন করাও অপরিহার্য যা সবসময়েই ইসলামের সত্য নীতি অনুসরণ করে চলবে এবং ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করা, স্থায়ী রাখা এবং তাকে ঠিকভাবে পরিচালিত করে যাওয়া ভিন্ন তার আর কোনোই উদ্দেশ্য হবে না। সারা পৃথিবীতে একটি মাত্র লোক যদি ঈমানদার হয়, তবুও সে একাকী বলে এবং নিজেকে নিঃসম্বল মনে করে বাতিল শাসনব্যবস্থার প্রভাব সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করা কিংবা اهون البليتين 'দু'টি বিপদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজতম বিপদকে গ্রহণ করার, অবাঞ্ছিত কুট-কৌশলের আশ্রয় নিয়ে কুফরী ও ফাসেক ব্যবস্থার অধীন নামেমাত্র ধর্মীয় জীবন-যাপন করার সুবিধা ভোগ করা তার পক্ষে আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। বরং সেই একাকী ও নিঃসঙ্গ ঈমানদার ব্যক্তিরও কর্তব্য হচ্ছে বিশ্বমানবকে আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান গ্রহণ করার আহ্বান জানানো। তার এই আহ্বানের প্রতি কেউ ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করলেও সমগ্র জীবনভর ইসলামের সত্য ও দৃঢ় পথে দাঁড়িয়ে থাকা এবং লোকদেরকে আহ্বান জানানো ও আহ্বান জানাতে জানাতেই মৃত্যুমুখে ঢলে পড়া তার কর্তব্য।

নিজ মুখে সত্যভ্রষ্ট দুনিয়ার পছন্দসই কোনো আমন্ত্রণ প্রচার করা এবং কাফেরদের নেতৃত্বের অধীন দুনিয়া যে পথে ছুটে চলেছে, সেই দিকে অগ্রসর হওয়া অপেক্ষা সত্য পথে সত্যের বাণী প্রচার করতে করতে মৃত্যুবরণ করাও তার পক্ষে শ্রেয়। আর তার আমন্ত্রণে কিছু সংখ্যক লোক যদি একত্রিত হয়, তাদের নিয়ে একটি বিশেষ সংঘ গঠন করা এবং

উল্লেখিত আদর্শের জন্য সমষ্টিগতভাবে চেষ্টা-সাধনা ও আন্দোলন করাই তার একান্ত কর্তব্য।

দীন ইসলাম সম্পর্কে আমার যতোটুকু জ্ঞান আছে এবং কুরআন ও হাদিস নিগূঢ়ভাবে অধ্যয়নের ফলে যতোটুকু বুদ্ধি ও স্বচ্ছ দৃষ্টি আমি লাভ করতে পেরেছি, তার ভিত্তিতে আমি এটাকেই দীন ইসলামের মৌলিক দাবি বলে জানতে পেরেছি। আল্লাহর কিতাব কুরআন মজীদ এটাই আমাদের নিকট দাবি করে বলে বুঝতে পেরেছি, আর আল্লাহর প্রেরিত সকল নবীর এটাই যে সুন্নাত ছিলো তা আমি নিঃসন্দেহে জানতে পেরেছি। আমি আমার এ মত ত্যাগ করতে মাত্রই রাজি নই যতোক্ষণ পর্যন্ত না কেউ কুরআন ও সুন্নাহর দলিল হতেই আমার ভুল প্রমাণ করে দিবে।

নেতৃত্বের ব্যাপারে আল্লাহর নিয়ম

আমাদের এই চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য বুঝে নেওয়ার পর এই ব্যাপারে বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব নিয়ম-নীতি কী-তাও জেনে নেওয়া আবশ্যক। কারণ, আমাদের কোনো উদ্দেশ্য লাভ করতে হলে তা আল্লাহর নিয়ম অনুসারেই লাভ করা সম্ভব, তার বিপরীত নয়। আমরা যে বিশ্ব প্রকৃতির বুকে বসবাস করি, আল্লাহ তাঁর একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ীই এটা সৃষ্টি করেছেন। এখানকার প্রত্যেকটি দ্রব্য ও বস্তুই সেই স্থায়ী ও অটল নিয়ম বিধানের অনুসারী। কেবল সদিচ্ছা ও নেক বাসনার দ্বারাই এখানে কোনো চেষ্টা সাফল্য লাভ করতে পারে না। মহান পবিত্র আত্মাদের (?) বরকতেই এখানে কোনো বাসনা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে না। এই প্রাকৃতিক দুনিয়ার মানুষের চেষ্টা-সাধনা ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য আল্লাহ নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করে চলা অপরিহার্য। একজন কৃষক সে যতোবড় বুজুর্গ হোক, মহৎ গুণের আধার এবং তাসবীহ পাঠে যতোই আত্মহারা হোক না কেনো যতোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে পরিপূর্ণ শ্রম সহকারে কৃষিকাজ সম্পন্ন না করবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তার একটি বীজও অঙ্কুরিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে নেতৃত্ব বিপ্লবের সেই চরম উদ্দেশ্যও কখনো কেবল দু'আ, তাবীজ, সদিচ্ছা ও নেক বাসনার সাহায্যে লাভ করা যাবে না। রাষ্ট্র বিপ্লবের জন্য আল্লাহর নিয়ম অনুধাবন করা একান্ত আবশ্যক। কারণ, দুনিয়ার নেতৃত্ব কায়েম হওয়ার এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়ম। এরই অধীন একজন লোক নেতৃত্ব লাভ করে এবং এ নিয়ম অনুযায়ীই এক-একজন লোক নেতৃত্ব হারায় বা নেতৃত্ব হতে বঞ্চিত হয়। এই সম্পর্কে আমার অন্যান্য রচনাবলিতেও আমি আলোচনা করেছি বটে; কিন্তু তা ছিলো সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আজ এখানে যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে এই বিষয়টির বিশ্লেষণ করা দরকার বলে মনে করি। কারণ, এই বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও পরিষ্কার ধারণা না হলে আমাদের কর্মপন্থা এবং চলার পথ আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হবে না।

মানুষের গোটা সত্তার বিশ্লেষণ করে দেখলে নিঃসন্দেহে জানতে পারা যায় যে, এর মধ্যে দু'টি দিক পরস্পর বিরোধী হয়েও পরস্পর ওতপ্রোতভাবে

জড়িত। মানুষের একটি দিক এই যে, তার একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ও পাশবিক সত্তা রয়েছে। তার এই সত্তার উপর ঠিক সেইসব নিয়ম ও আইন জারি হয়ে আছে, যা সমগ্র বস্তুগত ও জন্তু জানোয়ারের উপর বর্তমান। দুনিয়ার অন্যান্য সমগ্র জড় পদার্থ ও জান্তব সত্তার কার্যকারিতা ও কর্মক্ষমতা যেসব যন্ত্রপাতি ও বৈষয়িক উপায়-উপাদান এবং জড় অবস্থার উপর একান্ত নির্ভরশীল, মানুষের এই দিকটির কার্যকারিতা ও কর্মক্ষমতাও অনুরূপভাবে সেই সবেরই উপর নির্ভরশীল। মানুষের এই স্বাভাবিক Physical সত্তা তার যাবতীয় কর্মক্ষমতাকে একমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন যন্ত্রপাতি ও উপায়-উপাদানের সাহায্যে এবং স্বাভাবিক জড় অবস্থায় থেকেই ব্যবহার করতে পারে। এজন্যই তার সকল কাজের উপরই বাস্তব ও কার্যকারণ পরম্পরা জগতের সমগ্র শক্তিই বিপরীত কিংবা অনুকূল প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

মানুষের মধ্যে আর একটি দিক রয়েছে খুবই উজ্জ্বল এবং গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে তার মানবিক দিক– তার মানুষ হওয়ার দিক। অন্য কথায় বলা যায়, মানুষের একটি নৈতিক দিক রয়েছে, যা কোনো দিক দিয়েই প্রাকৃতিক সত্তার অধীন ও অনুসারী নয়। এই নৈতিক দিক, নৈতিক সত্তাই মানুষের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক দিকের উপর এক হিসেবে প্রভুত্ব বিস্তার করে। স্বাভাবিক ও জান্তব সত্তাকেও এটা অস্ত্র ও উপায় হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। সেই সঙ্গে বহির্বিশ্বের কার্যকারণসমূহকেও নিজের অধীন করতে এবং নিজের উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে যেসব নৈতিক ও চারিত্রিক গুণপণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তাই হচ্ছে এর কর্মচারী বা কার্যসম্পন্নকারী শক্তি। তার উপর প্রাকৃতিক নিয়মের কোনো প্রভুত্বই চলে না, চলে নৈতিক নিয়ম বিধানের প্রভুত্ব।

মানুষের উত্থান-পতন নৈতিক চরিত্রের উপর নির্ভরশীল

উল্লেখিত দু'টি দিক মানুষের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। সমষ্টিগতভাবে তার সাফল্য ও ব্যর্থতা এবং তার উত্থান ও পতন বৈষয়িক বা বস্তুনিষ্ঠ ও নৈতিক– এই উভয়বিধ শক্তির উপর একান্তভাবে নির্ভর করে। মানুষ না বস্তুনিষ্ঠ শক্তি নিরপেক্ষ হতে পারে, আর না নৈতিক শক্তির মুখাপেক্ষীহীন হয়ে কিছু সময় বাঁচতে পারে। তার উন্নতি লাভ হলে উভয় শক্তির ভিত্তিতেই হবে, আর পতন হলেও ঠিক তখনি হবে, যখন এই উভয়বিদ শক্তি হতেই সে বঞ্চিত হয়ে যাবে। অথবা এটা অন্যান্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়বে। কিন্তু একটু গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা করলে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা যাবে যে, মানব জীবনের মূল সিদ্ধান্তকারী গুরুত্ব রয়েছে নৈতিক শক্তির– বৈষয়িক বা বস্তুনিষ্ঠ শক্তির নয়। বৈষয়িক বস্তুনিষ্ঠ উপায়-উপাদান লাভ, স্বাভাবিক পন্থাসমূহের ব্যবহার এবং বাহ্যিক কার্যকারণ পরম্পরাসমূহের আনুকূল্য সাফল্য লাভের জন্য অপরিহার্য শর্ত এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কাজেই মানুষ যতোদিন এই কার্যকারণ পরম্পরা জগতে বসবাস করবে, এই শর্ত কোনোরূপেই উপেক্ষিত হতে পারে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যে মূল জিনিসটি মানুষের পতন ঘটায়, উত্থান দান করে এবং তার ভাগ্য নির্ধারনের ব্যাপারে যে জিনিসটির সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব রয়েছে, তা একমাত্র নৈতিক শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। এটা সুস্পষ্ট যে, মানুষকে এর দেহসত্তা বা এর পাশবিক দিকটার জন্য কখনো মানুষ বলে অভিহিত করা হয় না, বরং মানুষকে মানুষ বলা হয় এর নৈতিক গুণ-গরিমার কারণে। মানুষের একটি দেহ আছে, স্বতন্ত্র একটি সত্তা আছে, তা কতোখানি স্থান দখল করে থাকে, সে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে, কিংবা বংশ বৃদ্ধি করে; কিন্তু শুধু এই কারণে মানুষ দুনিয়ার অন্যান্য বস্তু ও জন্তু হতে স্বতন্ত্র মর্যাদালাভের অধিকারী হতে পারে না। মানুষ নৈতিক গুণসম্পন্ন জীব, তার নৈতিক স্বাধীনতা ও নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। ঠিক এ জন্যই মানুষকে দুনিয়ার সমগ্র জীব-জন্তু ও বস্তুর উপর বিশিষ্ট মর্যাদা দান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মানুষকে 'দুনিয়ার বুকে আল্লাহর খলিফা' হওয়ার

মহান মর্যাদায়ও অভিষিক্ত করা হয়েছে। অতএব মানবতার মূল প্রাণবস্তু প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যখন মানুষের নৈতিকতা, তখন মানুষের জীবনে গঠন-ভাঙন ও উন্নতি-অবনতির ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী গুরুত্বও যে সেই নৈতিক চরিত্রেই রয়েছে তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত মানুষের উত্থান-পতনের উপর তার নৈতিক নিয়ম-বিধানের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান।

এই নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করার পর আমরা যখন নৈতিক চরিত্রের গভীরতর বিশ্লেষণ করি, তখন নীতিগতভাবে এর দু'টি প্রধান দিক আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়– একটি হচ্ছে মৌলিক মানবীয় চরিত্র, অপরটি হচ্ছে ইসলামী নৈতিক চরিত্র।

মৌলিক মানবীয় চরিত্রের বিশ্লেষণ

মৌলিক মানবীয় চরিত্র বলতে বোঝায় সেসব গুণবৈশিষ্ট্য যার উপর মানুষের নৈতিক সত্তার ভিত্তি স্থাপিত হয়। দুনিয়ার মানুষের সাফল্য লাভের জন্য অপরিহার্য যাবতীয় গুণ-গরিমাই এর অন্তর্ভুক্ত। মানুষ কোনো সৎ উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করুক, কী ভুল ও অসৎ উদ্দেশ্যে-সর্বাবস্থায় তা একান্তই অপরিহার্য। মানুষ আল্লাহ, অহী, রাসূল এবং পরকাল বিশ্বাস করে কী করে না, তার হৃদয় কলুষমুক্ত কি-না, নিয়ত ও লক্ষ্য কল্যাণময় কি-না, সে নিজে সৎ গুণ ও সৎকাজে ভূষিত কি-না, সদুদ্দেশ্যে কাজ করে, না অসদুদ্দেশ্যে কাজ করে, উল্লেখিত চরিত্রের ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। কারো মধ্যে ঈমান থাকুক কী না থাকুক, তাদের জীবন পবিত্র হোক কী অপবিত্র, তার চেষ্টা-সাধনার উদ্দেশ্য সৎ হোক কী অসৎ এসব প্রশ্নের উর্ধ্বে থেকে পার্থিব জগতে সাফল্য লাভের জন্য অপরিহার্য গুণগুলো কেউ আয়ত্ত করলেই সে নিশ্চিতরূপে সাফল্যমণ্ডিত হবে এবং ঐসব গুণের দিক দিয়ে যারা পশ্চাদপদ, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা প্রথম ব্যক্তির পশ্চাতে পড়ে থাকবে।

ঈমানদার, কাফের, নেককার, বদকার, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বিপর্যয়কারী প্রভৃতি যে যাই হোক না কেনো, তার মধ্যে যদি ইচ্ছাশক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তি, প্রবল বাসনা, উচ্চাশা ও নির্ভীক সাহস, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা, তিতিক্ষা ও কৃচ্ছসাধনা, বীরত্ব ও বীর্যবত্তা, সহনশীলতা ও পরিশ্রম প্রিয়তা, উদ্দেশ্যের আকর্ষণ এবং সেজন্য সবকিছু উৎসর্গ করার প্রবণতা, সতর্কতা, দূরদৃষ্টি ও অন্তরদৃষ্টি, বোধশক্তি ও বিচার ক্ষমতা, পরিস্থিতি যাচাই করা এবং তদনুযায়ী নিজেকে ঢেলে গঠন করা ও অনুকূল কর্মনীতি গ্রহণ করার যোগ্যতা, নিজের হৃদয়াবেগ, ইচ্ছা, বাসনা, স্বপ্ন সাধ ও উত্তেজনার সংযমশক্তি এবং অন্যান্য মানুষকে আকৃষ্ট করা, তাদের হৃদয়মনে প্রভাব বিস্তার করা ও তাদেরকে কাজে নিযুক্ত করার দুর্বার বিচক্ষণতা যদি কারো মধ্যে পুরোপুরিভাবে বর্তমান থাকে, তবে এ দুনিয়ায় তার জয় সুনিশ্চিত।

সেই সাথে এমন গুণও কিছু না কিছু থাকা অপরিহার্য, যা মনুষ্যত্বের মূল-যাকে সৌজন্য ও ভদ্রতামূলক স্বভাব-প্রকৃতি বলা যায়; এরই বদৌলতে এক-একজন লোকের সম্মান-মর্যাদা, মানব সমাজে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত

হয়ে থাকে। আত্মসম্মান, জ্ঞান, বদান্যতা, দয়া-অনুগ্রহ, সহানুভূতি, সুবিচার, নিরপেক্ষতা, ঔদার্য ও হৃদয়মনের প্রসারতা, বিশালতা, দৃষ্টির উদারতা, সত্যবাদিতা ও সত্যপ্রিয়তা, বিশ্বাসপরায়ণতা, ন্যায়-নিষ্ঠা, ওয়াদাপূর্ণ করা, বুদ্ধিমত্তা, সভ্যতা, ভব্যতা, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা এবং মন ও আত্মার সংযম শক্তি প্রভৃতি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

কোনো জাতির বা মানব গোষ্ঠীর অধিকাংশ লোকের মধ্যে যদি উল্লেখিত গুণাবলির সমাবেশ হয়, তবে মানবতার প্রকৃত মূলধনই তার অর্জিত হয়েছে বলে মনে করতে হবে এবং এর ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী সমাজ সংস্থা গঠন করা তার পক্ষে অতীব সহজসাধ্য হবে। কিন্তু এই মূলধন সমাবিষ্ট হয়ে কার্যত একটি সুদৃঢ় ও ক্ষমতাসম্পন্ন সামাজিক রূপলাভ করতে পারে না যতোক্ষণ পর্যন্ত না তার সাথে আরো কিছু নৈতিক গুণ এসে মিলিত হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সমাজের সমগ্র কিংবা অধিকাংশ মানুষই একটি সামগ্রিক লক্ষ্য নিজেদের চরম লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করবে। সেই লক্ষ্যকে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ– এমনকি, নিজের ধন-প্রাণ ও সম্পদ-সন্তান হতেও অধিক ভালোবাসবে, তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম ভালোবাসা সহানুভূতির মনোভাব প্রবল হবে, তাদের মধ্যে পরস্পর মিলেমিশে কাজ করার মনোভাব থাকবে। সুসংগঠিত ও সংঘবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনার জন্য যতোখানি আত্মদান অপরিহার্য, তা করতে তারা প্রতিনিয়ত প্রস্তুত থাকবে। ভালো ও মন্দ নেতার মধ্যে পার্থক্য করার মতো বুদ্ধি-বিবেচনা তাদের থাকতে হবে– যেনো যোগ্যতম ব্যক্তি তাদের নেতা নিযুক্ত হতে পারে। তাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অপরিসীম দূরদৃষ্টি ও গভীর ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য অন্যান্য গুণাবলিও বর্তমান থাকা দরকার। সমাজের সকল লোককে নিজেদের নেতৃবৃন্দের আদেশ পালন ও অনুগমনে অভ্যস্থ হতে হবে। তাদের উপর জনগণের বিপুল আস্থা থাকতে হবে এবং নেতৃবৃন্দের নির্দেশে নিজেদের সমগ্র হৃদয়, মন, দেহের শক্তি এবং যাবতীয় বৈষয়িক উপায়-উপাদান লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়ার জন্য যে কোনো কাজে জনমত প্রয়োগ করতে প্রস্তুত থাকবে; শুধু তা-ই নয়, গোটা জাতির সামগ্রিক জনমত এতো সজাগ-সচেতন ও তীব্র হতে হবে যে সামগ্রিক কল্যাণের বিপরীত ক্ষতিকারক কোনো জিনিসকেই নিজেদের মধ্যে এক মুহূর্তের তরেও টিকতে দেবে না।

বস্তুত এগুলোই হচ্ছে মৌলিক মানবীয় চরিত্র। এগুলোকে আমি "মৌলিক মানবীয় চরিত্র" বলে এজন্য অভিহিত করেছি যে, মূলত এ নৈতিক

গুণগুলোই হচ্ছে মানুষের নৈতিক শক্তি ও প্রতিভার মূল উৎস। মানুষের মধ্যে এ গুণাবলির তীব্র প্রভাব বিদ্যমান না থাকলে কোনো উদ্দেশ্যের জন্যই কোনো সার্থক সাধনা করা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব হয় না। এ গুণগুলোকে ইস্পাতের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। ইস্পাতের মধ্যে দৃঢ়তা, অক্ষয়তা ও তীব্রতা রয়েছে, এরই সাহায্যে একটি হাতিয়ার অধিকতর শাণিত ও কার্যকরী হতে পারে। অতঃপর তা ন্যায় কাজে ব্যবহৃত হবে কী অন্যায় কাজে– সে প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। যার সৎ উদ্দেশ্য রয়েছে এবং এবং সে জন্য কাজ করতে চায়, ইস্পাত নির্মিত অস্ত্রই তার জন্য বিশেষ উপকারী হতে পারে, পঁচা কাঠ নির্মিত অস্ত্র নয়। কারণ, আঘাত সহ্য করার মতো কোনো ক্ষমতাই তাতে নেই। ঠিক একথাটি নবী করীম সা. হাদীসে এরশাদ করেছেন–

خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ.

"তোমাদের মধ্যে ইসলাম পূর্ব জাহেলি যুগের উত্তম লোকগণ ইসলামী যুগেও উত্তম ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হবে।"

অর্থাৎ জাহেলি যুগে যাদের মধ্যে যোগ্যতা ও বলিষ্ঠ কর্মক্ষমতা এবং প্রতিভা বর্তমান ছিলো ইসলামের মধ্যে এসে তারাই যোগ্যতম কর্মী প্রতিপন্ন হয়েছিলো। তাদের কর্মক্ষমতা উপযুক্ত ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে। পার্থক্য শুধু এতোটুকু যে, পূর্বে তাদের প্রতিভা ও কর্মক্ষমতা ভুল পথে ব্যবহার হতো, এখন ইসলাম তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করেছে। কিন্তু অকর্মণ্য ও হীনবীর্য লোক না জাহিলিয়াতের যুগে কোনো কার্যসম্পাদন করতে পেরেছে, আর না ইসলামের কোনো বৃহত্তম খেদমত আঞ্জাম দিতে সমর্থ হয়েছে। আরব দেশে নবী করীম সা. যে বিরাট অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছিলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তার সুদূর প্রসারী প্রভাব সিন্ধু নদ হতে শুরু করে আটলান্টিক মহাসাগরের বেলাভূমি পর্যন্ত দুনিয়ার একটি বিরাট অংশের উপর বিস্তৃত হয়েছিলো– তার মূল কারণ এটাই ছিলো যে, অরব দেশের সর্বাপেক্ষা উত্তম ও প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ তার আদর্শানুগামী হয়েছিলো। তাদের মধ্যে উক্তরূপ চরিত্রের বিরাট শক্তি নিহিত ছিলো। মনে করা যেতে পারে, আরবের অকর্মণ্য, অপদার্থ, হীনবীর্য, ইচ্ছাশক্তি বিবর্জিত, বিশ্বাস-অযোগ্য লোকদের একটি বিরাট ভিড় যদি নবী করীম সা.-এর চারপাশে জমায়েত হতো, তবে অনুরূপ ফল কখনোই লাভ করা সম্ভব হতো না। একথা একেবারেই স্বতঃসিদ্ধ।

ইসলামী নৈতিকতা

নৈতিক চরিত্রের দ্বিতীয় প্রকার যাকে আমি “ইসলামী নৈতিকতা” বলে অভিহিত করেছি, এ সম্পর্কেও আলোচনা করতে হবে। মূলত এটা মৌলিক মানবীয় চরিত্র হতে স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর কোনো জিনিস নয়, বরং তার বিশুদ্ধকারী ও পরিপূরক মাত্র।

ইসলাম সর্বপ্রথম মানুষের মৌলিক মানবীয় চরিত্রকে সঠিক ও নির্ভুল কেন্দ্রের সাথে যুক্ত করে দেয়। অতঃপর এটা সম্পূর্ণরূপে কল্যাণময় শক্তিতে পরিণত হয়। মৌলিক মানবীয় চরিত্র একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় বস্তুনিরপেক্ষ নিছক একটি শক্তি মাত্র। এই অবস্থায় তা ভালোও হতে পারে, মন্দও হতে পারে, কল্যাণকরও হতে পারে, অকল্যাণের হাতিয়ারও হতে পারে। যেমন– একখানী তরবারী, একটি তীর শাণিত অস্ত্র মাত্র। এটি একটি দস্যুর মুষ্টিবদ্ধ হলে যুলুম-পীড়নের একটি মারাত্মক হাতিয়ারে পরিণত হবে। আর আল্লাহর পথে জিহাদকারীর হাতে পড়লে এটা হতে পারে সমস্ত কল্যাণের নিয়ামক। অনুরূপভাবে “মৌলিক মানবীয় চরিত্র” কারো মধ্যে শুধু বর্তমান থাকাই এর কল্যাণকর হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং নৈতিক শক্তি সঠিক পথে নিয়োজিত হওয়ার উপরই তা একান্তভাবে নির্ভর করে। ইসলাম একে সঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে মাত্র। ইসলামের তাওহীদী দাওয়াতের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে আল্লাহর সন্তোষ লাভ করা। এই দাওয়াত গ্রহণকারী লোকদের পার্থিব জীবনের সমগ্র চেষ্টা সাধনা ও শ্রম মেহনতকে আল্লাহর সন্তোষলাভের জন্যই নিয়োজিত হতে হবে। وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ “হে আল্লাহ আমাদের সকল চেষ্টা-সাধনা এবং সকল দুঃখ ও শ্রম স্বীকারের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে তোমার সন্তোষ লাভ।” ইসলামের দাওয়াত গ্রহণকারী ব্যক্তি চিন্তা ও কর্মের সমস্ত তৎপরতা আল্লাহ নির্ধারিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ হবে। اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ “হে আল্লাহ আমরা তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমার জন্য আমরা নামায ও সিজদায় ভূলুণ্ঠিত হই।”

ইসলাম মানুষের সমগ্র জীবন ও অন্তর্নিহিত শক্তি নিচয়কে এভাবেই নিয়ন্ত্রিত ও সংশোধিত করে। এই মৌলিক সংশোধনের ফলে উপরোল্লিখিত সমস্ত বুনিয়াদী মানবীয় চরিত্রই সঠিক পথে নিযুক্ত ও পরিচালিত হয় এবং তা ব্যক্তিস্বার্থ, বংশ, পরিবার কিংবা জাতি ও দেশের শ্রেষ্ঠত্ব বিধানের জন্য অযথা ব্যয়িত না হয়ে একান্তভাবেই সত্যের বিজয় সম্পাদনের জন্যই সঙ্গতরূপে ব্যয় হতে থাকে। এর ফলেই তা একটি নিছক শক্তি মাত্র হতে উন্নীত হয়ে সমগ্র পৃথিবীর জন্য একটি কল্যাণ ও রহমতের বিরাট উৎসে পরিণত হয়।

দ্বিতীয়, ইসলাম মৌলিক মানবীয় চরিত্রকে সুদৃঢ় করে দেয় এবং চরম প্রান্তসীমা পর্যন্ত এর ক্ষেত্র ও পরিধি সম্প্রসারিত করে। উদাহরণ স্বরূপ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার উল্লেখ করা যেতে পারে। সর্বাপেক্ষা অধিক ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু ব্যক্তির মধ্যেও যে ধৈর্য ক্ষমতা দেখতে পাওয়া যায়, তা যদি নিছক বৈষয়িক স্বার্থের জন্য হয় এবং শিরক ও বস্তুবাদী চিন্তার মূল হতে 'রস' গ্রহণ করে, তবে তার একটি সীমা আছে, যে পর্যন্ত পৌছে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। অতঃপর তা কেঁপে উঠে, নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। কিন্তু যে ধৈর্য ও তিতিক্ষা তাওহীদের উৎসমূল হতে 'রস' গ্রহণ করে এবং যা পার্থিব স্বার্থলাভের জন্য নয়, একান্তভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত– তা ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষার এক অতল স্পর্শ মহাসাগরে পরিণত হবে। দুনিয়ার সমগ্র দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবত মিলিত হয়েও তাকে শূন্য ও শুষ্ক করতে সমর্থ হয় না।

এজন্যই 'অমুসলিম'দের ধৈর্য খুবই সংকীর্ণ ও নগণ্য হয়ে থাকে। যুদ্ধের মাঠে তারা হয়তো গোলাগুলির প্রবল আক্রমণের সামনে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রতিরোধ করেছে। কিন্তু পর মুহূর্তেই নিজেদের পাশবিক লালসা চরিতার্থ করার সুযোগ আসা মাত্রই প্রবৃত্তির অসৎ বাসনা এবং সামান্য উত্তেজনার আঘাতে তা চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু ইসলাম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাকে জীবনের বিশাল ক্ষেত্রে বিস্তৃত করে দেয় এবং সামান্য ও নির্দিষ্ট কয়েকটি দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবত প্রতিরোধের ব্যাপারেই নয়, সর্বপ্রকার লোভ-লালসা, ভয়, আতঙ্ক ও আশঙ্কা এবং প্রত্যেকটি পাশবিক বৃত্তির মোকাবিলায় স্থিতিলাভের জন্য এটি একটি বিরাট শক্তির কাজ করে। বস্তুত ইসলাম মানুষের সমগ্র জীবনকে একটি অচল-অটল ধৈর্যপূর্ণ পর্বতসম সহিষ্ণু জীবনে পরিণত করে। জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপের

সঠিক পন্থা অবলম্বন করাই হয় এহেন ইসলামী জীবনের মূলনীতি। তাতে সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা, বিপদ-মুসিবত, ক্ষতি-লোকসান বরদাশত করতে হলেও এ জীবনে এর কোনো 'সুফল' পাওয়া না গেলেও জীবনের গতি ধারায় একবিন্দু পরিমাণ বক্রতা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে এই জীবন কোনোরূপ স্খলন বরদাশত করতে পারে না। অভাবিত পূর্ব সুযোগ-সুবিধা লাভ, উন্নতি এবং আশা-ভরসার শ্যামল-সবুজ বাগিচা দেখতে পেলেও নয়। পরকালের নিশ্চিত সুফলের সন্দেহাতীত আশায় দুনিয়ার সমগ্র জীবন অন্যায় ও পাপ হতে বিরত থাকা এবং পুণ্য ও কল্যাণের পথে দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হওয়ারই নাম হচ্ছে ইসলামী সহিষ্ণুতা-ইসলামী সবর। পরন্তু, কাফেরদের জীবনের খুব সংকীর্ণতম পরিবেশের মধ্যে ততোধিক সংকীর্ণ ধারণা অনুযায়ী সহিষ্ণুতার যে রূপ দেখতে পাওয়া যায়, মুসলমানদের জীবনে তাও অনিবার্যরূপে পরিলক্ষিত হবে। এই উদাহরণের ভিত্তিতে অন্যান্য সমগ্র মৌলিক মানবীয় চরিত্র সম্পর্কেও ধারণা করা যেতে পারে এবং বিশুদ্ধ ও নির্ভুল চিন্তা ও আদর্শভিত্তিক না হওয়ার দরুন কাফেরদের জীবন কতো দুর্বল এবং সংকীর্ণ হয়ে থাকে তাও নিঃসন্দেহে অনুধাবন করা যেতে পারে। কিন্তু ইসলাম সেইসবকে বিশুদ্ধ ও সুষ্ঠু ভিত্তিতে স্থাপিত করে অধিকতর মজবুত এবং বিস্তৃত ও বিশাল অর্থদান করে।

তৃতীয়, ইসলাম মৌলিক মানবীয় চরিত্রের প্রাথমিক পর্যায়ের উপর মহান উন্নত নৈতিকতার একটি অতি জাঁকজমকপূর্ণ পর্যায় রচনা করে দেয়। এর ফলে মানুষ সৌজন্য ও মাহাত্ম্যের এক চূড়ান্ত ও উচ্চ পর্যায়ে আরোহণ করে থাকে। ইসলাম মানুষের হৃদয়-মনকে স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা, অত্যাচার, নির্লজ্জতা, অসংলগ্নতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করে দেয় এবং তাতে আল্লাহর ভয়, তাকওয়া, আত্মশুদ্ধি, সত্যবাদিতা ও সত্যপ্রিয়তা জাগিয়ে তোলে। তার মধ্যে নৈতিক দায়িত্ববোধ অত্যন্ত তীব্র ও সচেতন করে তোলে। আত্মসংযমে তাকে সর্বতোভাবে অভ্যস্ত, নিখিল সৃষ্টি জগতের প্রতি তাকে দয়াবান, সৌজন্যশীল, অনুগ্রহ সম্পন্ন, সহানুভূতিপূর্ণ, বিশ্বাসভাজন, স্বার্থহীন, সদিচ্ছাপূর্ণ, নিষ্কলুষ, নির্মল ও নিরপেক্ষ, সুবিচারক এবং সর্বক্ষণের জন্য সত্যবাদী ও সত্যপ্রিয় করে দেয়। তার মধ্যে এমন এক উচ্চ পবিত্র প্রকৃতি লালিত-পালিত হতে থাকে, যার নিকট সবসময় কল্যাণেরই আশা করা যেতে পারে– অন্যায়

এবং পাপের কোনো আশঙ্কা তার দিক হতে থাকতে পারে না। উপরন্তু, ইসলাম মানুষকে কেবল ব্যক্তিগতভাবে সৎ বানিয়েই ক্ষ্যান্ত হয় না; তা যথেষ্টও মনে করে না। রাসূলের বাণী অনুযায়ী তাকে مِفْتَاحٌ لِلْخَيْرِ وَ مِغْلَاقٌ لِلشَّرِّ "কল্যাণের দ্বার উৎঘাটন এবং অকল্যাণের পথ রোধকারীও বানিয়ে দেয়।" অন্য কথায় গঠনমূলক দৃষ্টিতে ইসলাম তার উপর ন্যায়ের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ ও মূলোৎপাটনের বিরাট কর্তব্য পালনের দায়িত্ব অর্পণ করে। এরূপ স্বভাব-প্রকৃতি লাভ করতে পারলে এবং কার্যত ইসলামের বিরাট মহান মিশনের জন্য সাধনা করলে এর সর্বাত্মক বিজয়াভিযানের মোকাবিলা করা কোনো পার্থিব শক্তিরই সাধ্যায়ত্ত হবে না।

নেতৃত্ব সম্পর্কে আল্লাহর নীতির সারকথা

দুনিয়ার নেতৃত্ব-কর্তৃত্বদানের ব্যাপারে সৃষ্টির প্রথম প্রভাত হতেই আল্লাহ তা'আলার একটি স্থায়ী নিয়ম ও রীতি চলে এসেছে এবং মানব জাতি বর্তমান প্রকৃতির উপর যতোদিন জীবিত থাকবে ততোদিন তা একই ধারায় জারি থাকবে, তাতে সন্দেহ নেই। এখানে প্রসঙ্গত সেই নিয়মের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

পৃথিবীর বুকে ইসলামী নৈতিকতা ও মৌলিক মানবীয় চরিত্রে ভূষিত এবং জাগতিক কার্যকারণ ও জড় উপায়-উপাদান প্রয়োগকারী কোনো সুসংগঠিত দল যখন বর্তমান না থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের চাবিকাঠি এমন একটি দলের হাতে ন্যস্ত করেন যে দল অন্তত মৌলিক মানবীয় চরিত্রে ভূষিত এবং জাগতিক উপায়-উপাদানসমূহ ব্যবহার করার দিক দিয়ে অন্যান্যের তুলনায় অধিকতর অগ্রসর। কারণ আল্লাহ তা'আলা তার এই পৃথিবীর শৃঙ্খলাবিধান করতে দৃঢ় সংকল্প। এই শৃঙ্খলাবিধানের দায়িত্ব ঠিক সেই মানব গোষ্ঠীকেই দান করেন, যারা সমসাময়িক দলসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম প্রমাণিত হবে। বস্তুত দুনিয়ার নেতৃত্বদান সম্পর্কে এটাই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার স্থায়ী নীতি।

কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোনো সুসংগঠিত দল যদি বাস্তবিকই বর্তমান থাকে, যা ইসলামী নৈতিকতা ও মৌলিক মানবীয় চরিত্র উভয় দিক দিয়েই অবশিষ্ট সকল মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট প্রমাণিত হবে এবং জাগতিক উপায় উপাদান ও জড় শক্তি প্রয়োগেও কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হবে না, তবে তখন পৃথিবীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের চাবিকাঠি অন্য কোনো দলের হাতে অর্পিত হওয়া একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। শুধু অসম্ভবই নয় তা অস্বাভাবিকও বটে, তা মানুষের জন্য নির্ধারিত আল্লাহর স্থায়ী নিয়ম-নীতিরও সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহ তা'আলা সত্যপন্থী ও নিষ্ঠাবান ঈমানদার লোকদের জন্য তাঁর কিতাবে যে প্রতিশ্রুতি উল্লেখ করেছেন, এটা তারও খেলাফ হয়ে পড়ে। দুনিয়ার বুকে সৎ, সত্যাশ্রয়ী ও ন্যায়পন্থী, আল্লাহর মর্জী অনুযায়ী বিশ্বপরিচালনায় যোগ্যতাসম্পন্ন একটি একনিষ্ঠ

মানব দল বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তিনি দুনিয়ার কর্তৃত্ব তাদের হাতে অর্পণ না করে কাফের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও আল্লাহদ্রোহী লোকদের হাতে ন্যস্ত করবেন, একথা কীরূপে ধারণা করা যেতে পারে?

কিন্তু বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, এরূপ অনিবার্য পরিণাম ঠিক তখনই লাভ করা যেতে পারে যখন উল্লেখিত গুণাবলি সমন্বিত একটি দল বাস্তবিকই দুনিয়াতে বর্তমান থাকবে। এক ব্যক্তির সৎ হওয়া এবং বিচ্ছিন্নভাবে অসংখ্য সৎ ব্যক্তির বর্তমান থাকায় দুনিয়ার নেতৃত্ব লাভের আল্লাহর নীতিতে বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম সৃষ্টি হতে পারে না– সেই ব্যক্তিগণ যতোবড়ো আওলিয়া, পয়গম্বরই হোক না কেনো আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার নেতৃত্বদানের যে ওয়াদা করেছেন, তা বিক্ষিপ্ত ও অসংঘবদ্ধ কয়েকজন ব্যক্তি সম্পর্কে নয়; এমন একটি দলকে এটা দান করার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন যা কার্যত ও বাস্তব ক্ষেত্রে নিজেকে خَيْرَ أُمَّةٍ "সর্বোত্তম জাতি" ও أُمَّةً وَّسَطًا "মধ্যম পন্থানুসারী জাতি" বলে প্রমাণ করতে পারবে।

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, উক্তরূপ গুণে ভূষিত একটি দলের শুধু বর্তমান থাকাই নেতৃত্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটার জন্য যথেষ্ট নয়, তা এমন নয় যে, এদিকে এরূপ একটি দল অস্তিত্ব লাভ করবে, আর ওদিকে সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ হতে কিছু সংখ্যক ফেরেশতা অবতরণ করে ফাসেক-কাফেরদেরকে নেতৃত্ব, কর্তৃত্বের গদি হতে বিচ্যুত করে দিবে এবং এই দলকে তদস্থলে আসীন করবে। এরূপ অস্বাভাবিক নিয়মে মানব সমাজে কখনোই কোনো পরিবর্তন সূচিত হতে পারে না। নেতৃত্বের ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্টি করতে হলে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ও বিভাগে, প্রত্যেক কদমে পদক্ষেপে, কাফের ও ফাসেকী শক্তির সাথে দ্বন্দ্ব ও প্রত্যক্ষ মোকাবিলা করতে হবে এবং সত্য প্রতিষ্ঠার বন্ধুর পথে সর্বপ্রকার কুরবানী দিয়ে নিজের সত্যপ্রীতির ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং নিজের সপ্রতিভ যোগ্যতাও প্রমাণ করতে হবে। বস্তুত এটা এমন একটি অনিবার্য শর্ত যা নবীদের উপরও প্রযোজ্য হয়েছে। অন্য কারো এই শর্ত পূরণ না করে সমাজ নেতৃত্বে কোনোরূপ পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারার তো কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

মৌলিক মানবীয় চরিত্র ও ইসলামী নৈতিক শক্তির তারতম্য

জাগতিক জড়শক্তি এবং নৈতিক শক্তির তারতম্য সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের গভীরতর অধ্যয়নের পর আল্লাহর এই সুন্নাত বা রীতি আমি বুঝতে পেরেছি যে, যেখানে নৈতিক শক্তি বলতে কেবলমাত্র মৌলিক মানবীয় চরিত্রই হবে, সেখানে জাগতিক উপায়-উপাদান ও জড়শক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। এমনকি, একটি দলের বৈষয়িক জড়শক্তি যদি বিপুল পরিমাণে বর্তমান থাকে তবে সামান্য নৈতিক শক্তির সাহায্যেই সে সমগ্র বিশ্ব গ্রাস করতে পারে। আর অপর দল নৈতিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠতর হয়েও কেবলমাত্র বৈষয়িক শক্তির অভাব হেতু সে পশ্চাৎপদ হয়ে থাকবে। কিন্তু যেখানে নৈতিক শক্তি বলতে ইসলামী নৈতিকতা ও মৌলিক মানবীয় চরিত্র উভয়ের প্রবল শক্তির সমন্বয় হবে, সেখানে বৈষয়িক জড়শক্তির সাংঘাতিক পরিমাণ অভাব হলেও নৈতিক শক্তিই জয়লাভ করবে এবং নিছক মৌলিক মানবীয় চরিত্র ও বৈষয়িক জড়শক্তির ভিত্তিতে যে শক্তিসমূহ মস্তক উত্তোলন করবে তা নিশ্চিতরূপেই পরাজিত হবে।

সুস্পষ্টরূপে বোঝার জন্য একটি হিসেবের অবতারণা করা যেতে পারে। মৌলিক মানবীয় চরিত্রের সাথে যদি একশত ভাগ বৈষয়িক জড়শক্তি অপরিহার্য হয় তবে ইসলামী নৈতিকতা ও মৌলিক মানবীয় চরিত্রের পূর্ণ সমন্বয় হওয়ার পর মাত্র ২৫ ভাগ বৈষয়িক জড়শক্তি উদ্দেশ্য লাভের জন্য যথেষ্ট হবে। অবশিষ্ট ৭৫ ভাগ জড়শক্তির অভাব কেবল ইসলামী নৈতিকতাই পূরণ করে দেবে। উপরন্তু নবী করীম সা.-এর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে জানা যায় যে, রাসূলে করীম সা. এবং তাঁর আসহাবদের সমপরিমাণ ইসলামী নৈতিকতার সাথে মাত্র শতকরা দশ ভাগ জড়শক্তিই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যথেষ্ট হলে পারে। এই নিগূঢ় তত্ত্ব ও সত্য বলা হয়েছে কুরআন মজীদের নিম্নলিখিত আয়াতে :

إِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ

"তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন পরম ধৈর্যশীল লোক হয় তবে তারা দু'শ জনের উপর জয়ী হতে পারবে।" —সূরা আনফাল : ৬৫

এই শেষোক্ত কথাটিকে নিছক 'অন্ধভক্তিভিত্তিক ধারণা' মনে করা ভুল হবে। আর আমি যে কোনো মু'জিযা বা কারামতের কথা বলছি তাও মনে করবেন না। বস্তুত এটা এক বাস্তব এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কথা, সন্দেহ নেই। এই সত্য তত্ত্ব কার্যকারণ পরম্পরা অনুযায়ী এই দুনিয়াতেই পরিস্ফুট হয়– সকল সময় এটা পরিস্ফূট হতে পারে। এর কারণ যদি বর্তমান থাকে, তবে তা নিশ্চয়ই বাস্তবে রূপায়িত হবে।

কিন্তু ইসলামী নৈতিকতা– যার মধ্যে মৌলিক মানবীয় চরিত্রও ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রয়েছে– বৈষয়িক জড়শক্তির শতকরা ৭৫ ভাগ বরং ৫০ ভাগ অভাব কীরূপে পূরণ করে, তা একটি নিগূঢ় রহস্য বটে। কাজেই সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে এর বিশ্লেষণ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

এ রহস্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সমসাময়িককালের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করাই যথেষ্ট। বিগত বিশ্বযুদ্ধে সর্বাত্মক বিপর্যয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে জাপান ও জার্মানির পরাজয় ঘটে। মৌলিক মানবীয় চরিত্রের দিক দিয়ে এই বিপর্যয়ের সংশ্লিষ্ট উভয় দলই প্রায় সমান। বরং সত্য কথা এই যে, কোনো দিক দিয়ে জার্মান ও জাপান মিত্র পক্ষের মোকাবিলায় অধিকতর মৌলিক মানবীয় চরিত্রের প্রমাণও উপস্থিত করেছে। জড়বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং এর বাস্তব প্রয়োগের ব্যাপারেও উভয় পক্ষই সমান ছিলো। বরং সত্য কথা এই যে, এই ক্ষেত্রে জার্মানির শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন বিদিত। কিন্তু এতদসত্বেও কেবল একটি ব্যাপারেই এক পক্ষ অপর পক্ষ হতে অনেকটা অগ্রসর আর তা হচ্ছে, বৈষয়িক কার্যকারণের আনুকূল্য। মিত্রপক্ষের জনশক্তি অপরাপর (জার্মান ও জাপান) সকল পক্ষ অপেক্ষাই অনেকগুণ বেশি। বৈষয়িক জড় উপায়-উপাদানও তার সর্বাপেক্ষা অধিক রয়েছে। এর ভৌগলিক অবস্থাও গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ঐতিহাসিক কার্যকারণ অপরাপর পক্ষের তুলনায় বহুগণ বেশি অনুকূল পরিস্থিতির উদ্ভব করে নিয়েছিলো। ঠিক এজন্য মিত্রপক্ষ বিজয় মাল্যে ভূষিত হয়। আর এজন্যই সে জাতির জনসংখ্যা অপর্যাপ্ত, বৈষয়িক জড় উপায়-উপাদান যার নিকট কম, তার পক্ষে অধিক জনসংখ্যা সমন্বিত ও বিপুল জাগতিক উপায়-উপাদান বিশিষ্ট জাতির মোকাবিলায় মস্তকোত্তলন এবং দণ্ডায়মান হওয়া প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়। মৌলিক মানবীয় চরিত্র ও জড়বিজ্ঞান ব্যবহারের দিক দিয়ে খুব বেশি অগ্রসর হলেও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। কারণ মৌলিক মানবীয় চরিত্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে উত্থিত জাতি– হয় জাতীয়তাবাদী হবে এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশও অধিকার করতে প্রয়াসী

হবে, নতুবা তা এক সার্বজনীন আদর্শ ও নিয়ম বিধানের সমর্থক হবে এবং তা গ্রহণ করার জন্য দুনিয়ার অন্যান্য জাতিসমূহকেও আহ্বান জানাবে। সে জাতির এ দু'টির যে কোনো এক অবস্থা নিশ্চয়ই হবে।

প্রথম অবস্থায় হলো বৈষয়িক জড়শক্তি ও জাগতিক উপায়-উপাদানের দিক দিয়ে অন্যান্য জাতি অপেক্ষো তার শ্রেষ্ঠ ও অগ্রসর হওয়া ভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করার দ্বিতীয় কোনো পন্থা আদৌ থাকতে পারে না। এর কারণ এই যে, যেসব জাতিকে সে প্রভুত্ব ও ক্ষমতা লিপ্সার অগ্নিযজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে কৃত সংকল্প হয়েছে তারা অত্যন্ত তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে তার প্রতিরোধ করবে এবং তার পথরোধ করতে নিজেদের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করবে। কাজেই তখন আক্রমণকারী জাতির পরাজয়ের সম্ভাবনা অনেক বেশি। কিন্তু উক্ত জাতির যদি দ্বিতীয় অবস্থা হয়– যদি তা কোনো সার্বজনীন আদর্শের নিশান বরদার হয়– তবে জাতিসমূহের মন ও মস্তিষ্ক প্রভাবান্বিত হওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তখন জাতিকে প্রতিবন্ধকতার পথ হতে অপসৃত করতে খুব বেশি শক্তি প্রয়োগ করার আবশ্যক হবে না। কিন্তু এখানে ভুললে চলবে না যে, মুষ্টিমেয় কয়েকটি মনমুগ্ধকর নীতি-আদর্শই কখনো মানুষের মন ও মস্তিষ্ক প্রভাবান্বিত করতে পারে না। সে জন্য সত্যিকার সদিচ্ছা, সহানুভূতি, হিতাকাঙ্ক্ষা, সততা, সত্যবাদিতা, নিঃস্বার্থতা, উদারতা, বদান্যতা, সৌজন্য ও ভদ্রতা এবং নিরপেক্ষ সুবিচার নীতি একান্ত অপরিহার্য। শুধু তাই নয়, এই মহৎ গুণগুলোকে যুদ্ধ-সন্ধি, জয়-পরাজয়, বন্ধুত্বতা-শত্রুতা এ সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই কঠিন পরীক্ষায় অত্যন্ত অকৃত্রিম ও নিষ্কলুষ প্রমাণিত হতে হবে। কিন্তু এরূপ ভাবধারার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে উন্নত চরিত্রের উচ্চতম ধাপের সাথে এবং তার স্থান মৌলিক মানবীয় চরিত্রের অনেক উর্ধ্বে। ঠিক এ কারণেই নিছক মৌলিক মানবীয় চরিত্র ও বৈষয়িক শক্তির ভিত্তিতে উত্থিত জাতি প্রকাশ্যভাবে জাতীয়তাবাদীই হোক কি গোপন জাতীয়তাবাদের সাথে কিছুটা সার্বজনীন আদর্শের প্রচার ও সমর্থন করার ছদ্মবেশই ধারণ করুক– একান্ত ব্যক্তিগত কিংবা শ্রেণিগত অথবা জাতীয় স্বার্থ লাভ করাই হয় তার যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা ও দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। বর্তমান সময় আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতিতে ঠিক এই ভাবধারাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই ধরনের যুদ্ধ-সংগ্রামের ক্ষেত্রে অতি স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেকটি জাতি প্রতিপক্ষের সামনে এক দুর্জয় দুর্গের ন্যায় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় এবং তার প্রতিরোধে স্বীয় সমগ্র নৈতিক ও বৈষয়িক শক্তি প্রয়োগ

করে। তখন আক্রমণকারী জাতির শ্রেষ্ঠতর জড়শক্তির আক্রমণে শত্রু পক্ষকে সে নিজ দেশের চতুর্সীমার মধ্যে কিছুতেই প্রবেশ করতে দিবে না।

কিন্তু এই সময় এরূপ পরিবেশের মধ্যে এমন একটি মানবগোষ্ঠী যদি বর্তমান থাকে প্রথমত তা একটি জাতির লোকদের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকলেও কোনো দোষ নেই– যদি তা একই জাতি হিসেবে না উঠে একটি আদর্শবাদী জামায়াত হিসেবে দণ্ডায়মান হয়, যা সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত, শ্রেণিগত জাতীয় স্বার্থপরতার বহু উর্ধ্বে থেকে বিশ্বমানবতাকে আমন্ত্রণ জানাবে যার সমগ্র চেষ্টা-সাধনার চরম লক্ষ্য হবে নির্দিষ্ট কতকগুলো আদর্শের অনুসরণের মধ্য দিয়ে বিশ্বমানবতার মুক্তিসাধন এবং সেই আদর্শ ও নীতিসমূহের ভিত্তিতে মানব জীবনের গোটা ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সাধন। ঐসব নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে এই দল যে জাতি গঠন করবে, তাতে জাতীয়, ভৌগোলিক, শ্রেণিগত ও বংশীয় বা গোত্রীয় বৈষম্যের নামগন্ধও থাকবে না। সকল মানুষই তাতে সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে এবং সকলেই সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারবে। এই নবপ্রতিষ্ঠিত জাতির মধ্যে নেতৃত্ব পথ নির্দেশকারী মর্যাদা কেবল সেই ব্যক্তি বা সেই মানব সমষ্টিই লাভ করতে পারবে, যারা সেই আদর্শ ও নীতির অনুসরণ করে চলার দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হবে। তখন তার বংশ মর্যাদা বা আঞ্চলিক জাতীয়তার কোনো তারতম্য বিচার হবে না, এমনকি এই নতুন সমাজ এতদূরও হতে পারে যে, বিজিত জাতির লোক ঈমান এনে নিজেকে অন্যান্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদর্শানুসরণে এবং যোগ্যতার প্রমাণ করতে পারলে বিজয়ী তার সকল চেষ্টা ও যুদ্ধ সংগ্রাম লব্ধ যাবতীয় 'ফল' তার পদতলে এনে ঢেলে দিবে এবং তাকে 'নেতা'রূপে স্বীকার করে নিজে 'অনুসারী' হয়ে কাজ করতে প্রস্তুত হবে।

এমন একটি আদর্শবাদী দল যখন নিজেদের আদর্শ প্রচার করতে শুরু করে, তখন এই আদর্শের বিরোধী লোকগণ তাদের প্রতিরোধ করতে উদ্যত হয়। ফলে উভয় দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের তীব্রতা যতোই বৃদ্ধি পায় আদর্শবাদী দল বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলায় ততোই উন্নত চরিত্র ও মহান মানবিক গুণ মহাত্ম্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে থাকে। সে তার কর্মনীতি দ্বারা প্রমাণ করে যে, মানব সমষ্টি তথা গোটা সৃষ্টিজগতের কল্যাণ সাধন ভিন্ন তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। বিরুদ্ধবাদীদের ব্যক্তিসত্ত্বা কিংবা তাদের জাতীয়তার সাথে এর কোনো শত্রুতা নেই। শত্রুতা আছে শুধু তাদের গৃহীত জীবনধারা ও

চিন্তা মতবাদের সাথে। তা পরিত্যাগ করলেই তার রক্ত পিপাসু শত্রুকেও প্রাণভরা ভালোবাসা দান করতে পারে– বুকের সঙ্গে মিলাতে পারে। পরন্তু সে আরো প্রমাণ করবে যে, বিরুদ্ধ পক্ষের ধন-দৌলত কিংবা তাদের ব্যবসায় ও শিল্পপণ্যের প্রতিও তার কোনো লালসা নেই, তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনই তার একমাত্র কাম্য। তা লাভ হলেই যথেষ্ট। তাদের ধন-দৌলত তাদেরই সৌভাগ্যের কারণ হবে। কঠিন কঠোরতম পরীক্ষার সময়ও এই দল কোনোরূপ মিথ্যা, প্রতারণা ও শঠতার আশ্রয় নেবে না। কুটিলতা ষড়যন্ত্রের প্রত্যুত্তরে তারা সহজ-সরল কর্মনীতিই অনুসরণ করবে। প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্র উত্তেজনার সময়ও অত্যাচার-অবিচার, উৎপীড়নের নির্মমতায় মেতে উঠবে না। যুদ্ধের প্রবল সংঘর্ষের কঠিন মুহূর্তেও তারা নিজেদের নীতি আদর্শ পরিত্যাগ করবে না। কারণ সেই আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যই তো তার জন্ম। এজন্য সততা, সত্যবাদিতা, প্রতিশ্রুতি পূরণ, নির্মল আচার-ব্যবহার ও নিঃস্বার্থ কর্মনীতির উপর তারা দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকে। নিরপেক্ষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রথমত আদর্শ হিসেবে সততা ও ন্যায়বাদের যে মানদণ্ড বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছিলো, নিজেকে এর কষ্টিপাথরে যাচাই করে সত্য এবং খাঁটি বলে প্রমাণ করে দেয়। শত্রু পক্ষের ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী, জুয়াড়ী, নিষ্ঠুর ও নির্দয় সৈন্যদের সাথে এই দলের আল্লাহভীরু, পবিত্র চরিত্র, মহান আত্মা-দয়ার্দ্র হৃদয় ও উদার উন্নত মনোবৃত্তি সম্পন্ন মুজাহিদদের যখন প্রবল মোকাবিলা হয়, তখন এই দলের প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যক্তিগত ও মানবিক গুণ-গরিমা প্রতিপক্ষের পাশবিকতা ও বর্বরতার উপর উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে লোকচক্ষুর সামনে প্রস্ফুটিত হতে থাকে। শত্রু পক্ষের লোক আহত বা বন্দী হয়ে আসলে চতুর্দিকে ভদ্রতা, সৌজন্য, পবিত্রতা ও নির্মল মানবিক চরিত্রের রাজত্ব বিরাজমান দেখতে পায় এবং তা দেখে তাদের কলুষিত আত্মাও পবিত্র ভাবধারার সংস্পর্শে কলুষমুক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে এই দলের লোক যদি বন্দী হয়ে শত্রু পক্ষের শিবিরে চলে যায়, সেখানকার অন্ধকারাচ্ছন্ন পূতিগন্ধময় পরিবেশে এদের মনুষ্যত্বের মহিমা আরো উজ্জ্বল ও চাকচিক্যপূর্ণ হয়ে উঠে। এরা কোনো দেশ জয় করলে বিজিত জনগণ প্রতিশোধের নির্মম আঘাতের পরিবর্তে ক্ষমা ও করুণা পায়, কঠোরতা নির্মমতার পরিবর্তে সহানুভূতি; গর্ব অহঙ্কার ও ঘৃণার পরিবর্তে পায় সহিষ্ণুতা ও বিনয়; ভর্ৎসনার পরিবর্তে পায় সাদর সম্ভাষণ এবং মিথ্যা প্রচারণার পরিবর্তে সত্যের মূলনীতিসমূহের বৈজ্ঞানিক প্রচার। আর এসব

দেখে খুশিতে তাদের হৃদয় মন ভরে উঠে। তারা দেখতে পায় যে, বিজয়ী সৈনিকরা তাদের নিকট নারীদেহের দাবি করে না, গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে ধন-সম্পত্তি খোঁজ করে বেড়ায় না, তাদের শৈল্পিক গোপন রহস্যের সন্ধান করার জন্যও এরা উদগ্রীব নয়, তাদের অর্থনৈতিক শক্তি সম্পদকে ধ্বংস করার চিন্তাও এদের নেই। তাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও সম্মান মর্যাদার উপরও এরা হস্তক্ষেপ করে না। বিজিত জনতা শুধু দেখতে পায়, এরা এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন এই জন্য যে, বিজিত দেশের একটি মানুষেরও সম্মান বা সতীত্ব যেনো নষ্ট না হয়, কারো ধনমাল যেনো ধ্বংস না হয়, কেউ যেনো সঙ্গত অধিকার হতে বঞ্চিত না থেকে যায়, কোনোরূপ অসচ্চরিত্রতা তাদের মধ্যে যেনো ফুটে না উঠে এবং সামগ্রিক যুলুম-পীড়ন যেনো কোনোরূপেই অনুষ্ঠিত হতে না পারে।

পক্ষান্তরে শত্রু পক্ষ যখন কোনো দেশে প্রবেশ করে, তখন সে দেশের সমগ্র অধিবাসী তাদের অত্যাচার, নির্মমতা ও অমানুষিক ধ্বংসলীলায় আর্তনাদ করে উঠে। একটু চিন্তা করলেই বোঝতে পারা যায়, এই ধরনের আদর্শবাদী জিহাদের সাথে জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ সংগ্রামের কতো আকাশ স্পর্শী পার্থক্য হয়ে থাকে। এই ধরনের লড়াইয়ে উচ্চতর মানবিকতা নগণ্য বৈষয়িক শক্তি সামর্থ্য সহকারে ও শত্রুপক্ষের লৌহবর্ম রক্ষিত পাশবিকতাকে যে অতি সহজেই প্রথম আক্রমণেই পরাজিত করবে তাতে আর সন্দেহ কী? বস্তুত উন্নত নির্মল নৈতিকতার হাতিয়ার বন্দুক-কামানের গোলাগুলি অপেক্ষাও দূর পাল্লায় গিয়ে লক্ষ্যভেদ করবে। প্রচণ্ড লড়াইয়ের কঠিন মুহূর্তেও শত্রুরা বন্ধুতে পরিণত হবে। দেশের পূর্বে মানুষের হৃদয়-মন বিজিত হবে, দেশের পর দেশ-জনপদের পর জনপদ বিনাযুদ্ধেই পরাজয় স্বীকার করে মুক্তির চিরন্তন স্বাদ গ্রহণ করে। ওদিকে এই সত্যনিষ্ঠ আদর্শবাদী দল যখন নিজেদের মুষ্টিমেয় জনসংখ্যা, অত্যল্প উপায়-উপাদান সহকারে গঠনমূলক কাজ শুরু করবে, তখন সেনাপতি, সৈনিক, যোদ্ধা, বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী, অস্ত্র-শস্ত্র, রসদ এবং যুদ্ধের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সবকিছুই ধীরে ধীরে বিরোধী শিবির হতে পাওয়া যাবে, তাতে সন্দেহ নেই।

আমার এই উক্তি নিছক কল্পনা-ধারণা এবং আন্দাজ-অনুমানের উপরই ভিত্তিশীল নয়, নবী করীম সা. ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সোনালী যুগের ঐতিহাসিক উদাহরণসমূহ হতে একথা প্রমাণিত হয় যে, ইতঃপূর্বেও এরূপ ঘটনা ঘটেছে এবং আজো এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। অবশ্য

সেজন্য শর্ত এই যে, এরূপ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুতি ও সৎ সাহস নিয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

আমি আশা করি, আমার উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনা হতে আমার একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে নৈতিক শক্তিই হচ্ছে শক্তির আসল উৎস। কাজেই দুনিয়ার কোনো মানব সমষ্টি যদি মৌলিক মানবীয় চরিত্রের সঙ্গে ইসলামী নৈতিকতারও আধার হয় তখন তার বর্তমানে অন্য কোনো দলের পক্ষে দুনিয়ার নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে থাকা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কঠিন এবং স্বভাবতই তা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত মুসলমানদের বর্তমান অধঃপতনের মূলীভূত কারণ কী; উপরের আলোচনা হতে তাও আশা করি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যারা না বৈষয়িক উপায়-উপাদান প্রয়োগ করবে, না মৌলিক মানবীয় চরিত্রে ভূষিত হবে, আর না সমষ্টিগতভাবে ইসলামী নৈতিকতার অস্তিত্বই তাদের মধ্যে থাকবে; তারা যে দুনিয়ার নেতৃত্বের আসনে কিছুতেই অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না, এটা সর্বজন বিদিত সত্য। এমতাবস্থায় এমন সকল কাফের লোকদেরই কর্তৃত্ব দান করা আল্লাহর স্থায়ী রীতি, যাদের ইসলামী নৈতিকতা না থাকলেও মৌলিক মানবীয় চরিত্র তো রয়েছে, আর জাগতিক জড় উপায়-উপাদান ব্যবহার এবং শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষার দিক দিয়ে নিজেদেরকে অন্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করেছে। এই ক্ষেত্রে মুসলমানদের কোনো অভিযোগ করা থাকলে তা তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই হতে পারে, এ ব্যাপারে আল্লাহর স্থায়ী নিয়ম-বিধানের আদৌ কোনো ক্রটি নেই। আর নিজেদের বিরুদ্ধে যদি বাস্তবিকই কোনো অভিযোগ জাগে, তাদের অনিবার্য ফলে নিজেদের যাবতীয় দোষ-ক্রটি সংশোধন করার জন্য যত্নবান হওয়া এবং যে কারণে মুসলমান নেতৃত্বের আসন হতে বিচ্যুত হয়ে অনুগত হতে বাধ্য হয়েছে সেই কারণ দূর করতে বদ্ধপরিকর হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

অতঃপর সুস্পষ্ট ভাষায় ইসলামী নৈতিকতার মূল ভিত্তিসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা একান্ত আবশ্যক। কারণ, আমি জানি এ ব্যাপারে মুসলমানদের ধারণা নিতান্ত অবাঞ্ছিতভাবে অস্পষ্ট এবং বিশিষ্ট হয়ে রয়েছে। এই অস্পষ্টতা ও অসংঘবদ্ধতার কারণেই ইসলামী নৈতিকতা আসলে যে কি জিনিস এবং এদিক দিয়ে মানুষের চরিত্র গঠন ও পূর্ণতা সাধনের জন্য কোন্ জিনিস কোন্ শ্রেণি পরম্পরা ও ক্রমিক ধারা অনুযায়ী তার মধ্যে লালিত-পালিত করা অপরিহার্য তা খুব কম লোকই জানতে পেরেছে।

ইসলামী নৈতিকতার চার পর্যায়

ইসলামী নৈতিকতা বলতে আমরা যা বুঝে থাকি, কুরআন ও হাদীসের শিক্ষানুযায়ী এর চারটি ক্রমিক পর্যায় রয়েছে। প্রথম ঈমান, দ্বিতীয় ইসলাম, তৃতীয় তাকওয়া এবং চতুর্থ ইহসান। বস্তুত এ চারটি পর্যায় পরস্পরা এমন স্বাভাবিক শ্রেণি পরম্পরা অনুযায়ী সুসংবদ্ধ হয়ে আছে যে, প্রত্যেকটি পরবর্তী পর্যায়ই পূর্ববর্তী পর্যায় হতে উদ্ভূত এবং অনিবার্যরূপে এরই উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য নিম্নবর্তী পর্যায় যতোক্ষণ না দৃঢ় পরিপক্ক হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত এর উপর পর্যায়ের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না। এই সমগ্র ইমারতের মধ্যে ঈমান হচ্ছে প্রাথমিক ভিত্তিপ্রস্তর এরই উপর ইসলামের স্তর রচিত হয়, তার উপর 'তাকওয়া' এবং সব পর্যায়ের উপরে হয় 'ইহসানের' প্রতিষ্ঠা। ঈমান না হলে ইসলামে তাকওয়া কিংবা ইহসান লাভ করার কোনো সম্ভাবনাই হতে পারে না। ঈমান দুর্বল হলে তার উপর উচ্চতর পর্যায়সমূহের দুর্বহ বোঝা চাপিয়ে দিলেও তা অতিশয় কাঁচা, শিথিল ও অন্তসারশূন্য হয়ে পড়বে। এই ঈমান সংকীর্ণ হলে যতোখানি তার ব্যাপ্তি হবে, ইসলাম এবং ইহসান ঠিক ততোখানি সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

অতএব ঈমান যতোক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ, সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত না হবে, দীন ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তার উপর ইসলাম, তাকওয়া কিংবা ইহসান প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তাও করতে পারে না। অনুরূপভাবে 'তাকওয়ার' পূর্বে 'ইসলাম' এবং ইহসানের পূর্বে 'তাকওয়া' বিশুদ্ধকরণ সুষ্ঠুতা বিধান এবং সম্প্রসারিতকরণ অপরিহার্য। কিন্তু সাধারণত আমরা এটাই দেখতে পাই যে, এই স্বাভাবিক ও নীতিগত শ্রেণি পরম্পরার প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয় এবং ঈমান ও ইসলামের পর্যায়ে পূর্ণতা সাধন ছাড়াই তাকওয়া ও ইহসানের আলোচনা শুরু করে দেওয়া হয়। এটা অপেক্ষাও দুঃখের বিষয় এই যে, সাধারণত লোকদের মনে ঈমান ইসলাম সম্পর্কে অত্যন্ত সংকীর্ণ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। এজন্যই শুধু বাহ্যিক বেশ-ভূষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, উঠা-বসা, চলা-ফেরা, খানা-পিনা, প্রভৃতি বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানসমূহ নির্দিষ্ট

পদ্ধতিতে করতে পারলেই 'তাকওয়ার' পূর্ণতা সাধন হয়ে গেলো। আর ইবাদতের মধ্যে নফল নামায, দরূদ, অজিফা পাঠ এই ধরনের কয়েকটি বিশেষ কাজ করলেই ইহসানের উচ্চতম অধ্যায় লাভ হয় বলে ধারণা করে। অথচ এ ধরনের তাকওয়া ও ইহসানের সঙ্গে সঙ্গে লোকদের জীবনের এমন অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শনও পাওয়া যায় যার ভিত্তিতে অনায়াসে বলা চলে যে, তাকওয়া ও ইসলাম তো দূরের কথা, আসল ঈমানই এখন পর্যন্ত তার মধ্যে পরিপক্কতা ও সুষ্ঠুতা লাভ করে নি। এরূপ ভুল ধারণা ও ভুল দীক্ষার পদ্ধতি আমাদের মধ্যে যতোদিন বর্তমান থাকবে ততোদিন পর্যন্ত আমরা ইসলামী নৈতিকতার অপরিহার্য অধ্যায়সমূহ কখনো অতিক্রম করতে পারবো বলে আশা করা যায় না। এজন্যই ঈমান, ইসলাম, তাকওয়া, ইহসান এই চারটি অধ্যায় সম্পর্কে পূর্ণ সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা এবং সেই সংগে এদের স্বাভাবিক ও ক্রমিক শ্রেণি পরম্পরাও অনুধাবন করা একান্তই অপরিহার্য।

ঈমান

সর্বপ্রথম ঈমান সম্পর্কেই আলোচনা করা যাক। কারণ, এটা ইসলামী জিন্দেগীর প্রাথমিক ভিত্তিপ্রস্তর। তাওহীদ ও রিসালাত আল্লাহর একত্ব ও হযরত মুহাম্মদ সা.-কে রাসূলরূপে স্বীকার করে নেওয়াই এক ব্যক্তির ইসলামের পরিসীমায় অনুপ্রবেশ লাভের জন্য যথেষ্ট। তখন তার সাথে ঠিক একজন মুসলমানেরই ন্যায় আচরণ করা আবশ্যক– তখন এরূপ আচরণ ও ব্যবহার পাবার তার অধিকারও হয়। কিন্তু সাধারণ স্বীকারোক্তি এমনি আইনগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট হলেও ইসলামী জিন্দেগীর সমগ্র 'ত্রিতল বিশিষ্ট উচ্চ প্রাসাদের' ভিত্তিপ্রস্তর হওয়ার জন্যও কি এটা যথেষ্ট হতে পারে? সাধারণ লোকেরা এরূপই ধারণা করে। আর এজন্য যেখানেই এই স্বীকারোক্তিটুকু পাওয়া যায়, সেখানেই বাস্তবিকভাবে ইসলাম তাকওয়া ও ইহসানের উচ্চতলসমূহ তৈরি করার কাজ শুরু করে দেওয়া হয়। ফলে সাধারণত এটা হাওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদেরই? অনুরূপ ক্ষণভঙ্গুর ও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে। বস্তুত একটি পরিপূর্ণ ইসলামী জিন্দেগী গঠনের জন্য সুবিস্তারিত সম্প্রসারিত, ব্যাপক গভীর ও সুদৃঢ় ঈমান একান্তই অপরিহার্য। ঈমানের বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা হতে জীবনের কোনো একটি দিক বা বিভাগও যদি বাইরে পড়ে থাকে, তবে ইসলামী জিন্দেগীর সেই দিকটি পুনর্গঠন লাভ হতে বঞ্চিত থেকে যাবে এবং তার

গভীরতায় যতোটুকু অভাবই থাকবে, ইসলামী জিন্দেগীর প্রাসাদ সেখানেই দুর্বল ও শিথিল হয়ে থাকবে, এ কথায় কোনোই সন্দেহ নেই।

উদাহরণ স্বরূপ "আল্লাহর প্রতি ঈমানের" উল্লেখ করা যেতে পারে। বস্তুত আল্লাহর প্রতি ঈমান দীন ইসলামের প্রাথমিক ভিত্তিপ্রস্তর। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে যে, আল্লাহকে স্বীকার করার উক্তিটুকু সাদাসিধে পর্যায় অতিক্রম করে বিস্তারিত ও সম্প্রসারিত ক্ষেত্রে প্রবেশ করার পর এর বিভিন্ন রূপ দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও "আল্লাহর প্রতি ঈমান" একথা বলে শেষ করা হয় যে, আল্লাহ বর্তমান আছেন। সন্দেহ নেই, পৃথিবীর তিনি সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয়, এটাও সত্য কথা। কোথাও আরো একটু অগ্রসর হয়ে আল্লাহকে মা'বুদ স্বীকার করা হয় এবং তার উপাসনা করার প্রয়োজনীয়তাও মেনে নেওয়া হয়। কোথাও আল্লাহর গুণ এবং তাঁর অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত ও ব্যাপক ধারণাও শুধু এতোটুকু হয় যে, আলেমুল গায়েব সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রোষ্টা, প্রার্থনা শ্রবণকারী, অভাব ও প্রয়োজন পূরণকারী তিনি এবং ইবাদতের সব খুঁটিনাটি রূপ একমাত্র তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করা বাঞ্ছনীয়। এখানে কেউ তাঁর শরীক নেই। আর "ধর্মীয় ব্যাপারসমূহে" চূড়ান্ত দলীল হিসেবে আল্লাহর কিতাবকেও স্বীকার করা হয়। কিন্তু এরূপ বিভিন্ন ধারণা বিশ্বাসের পরিণামে যে একই ধরনের জীবনব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না, তা সুস্পষ্ট কথা। বরং যে ধারণা যতোখানি সীমাবদ্ধ, কর্মজীবনে ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে ইসলামী বৈশিষ্ট্য অনিবার্যরূপে ততোখানি সংকীর্ণ হয়ে দেখা দিবে এমনকি যেখানে সাধারণ ধর্মীয় ধারণা অনুযায়ী "আল্লাহর প্রতি ঈমান" অপেক্ষাকৃতভাবে অতীব ব্যাপক ও সম্প্রসারিত হবে, সেখানেও ইসলামী জিন্দেগীর বাস্তবরূপ এই হবে যে, একদিকে আল্লাহর দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করা হবে এবং অন্যদিকে আল্লাহর 'আনুগত্য' করার কাজও সেই সংগেই সম্পন্ন করা হবে কিংবা ইসলামী নেজাম ও কাফেরী নেজাম মিলিয়ে একটি জগাখিচুরী তৈরি করা হবে।

এভাবে "আল্লাহর প্রতি ঈমান" এর গভীরতার মাপকাঠিও বিভিন্ন। কেউ আল্লাহকে স্বীকার করা সত্ত্বেও সাধারণ জিনিসকেও আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয় না। কেউ আল্লাহর কোনো কোনো জিনিস অপরাপর জিনিস অপেক্ষা 'অধিক প্রিয়' বলে মনে করে। আবার অনেক জিনিসকে আল্লাহর অপেক্ষাও প্রিয়তর হিসেবে গ্রহণ করে; কেউ নিজের জান-মাল

পর্যন্ত আল্লাহর জন্য কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু নিজের মনের ঝোঁক-প্রবণতা, নিজের মতবাদ ও চিন্তাধারা কিংবা নিজের খ্যাতি ও প্রসিদ্ধিকে বিন্দুমাত্র ব্যাহত করতে প্রস্তুত হয় না। ঠিক এই হার অনুসারেই ইসলামী জিন্দেগীর স্থায়িত্ব ও ভঙ্গুরতা নির্ধারিত হয়ে থাকে। আর যেখানেই ঈমানের বুনিয়াদ দুর্বল থেকে যায়, ঠিক সেখানেই মানুষের ইসলামী নৈতিকতা নির্মমভাবে প্রতারিত হয়।

বস্তুত ইসলামী জিন্দেগীর একটি বিরাট প্রাসাদ একমাত্র সেই তাওহীদ স্বীকারের উপরই স্থাপিত হতে পারে, যা মানুষের গোটা ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনের উপর সম্প্রসারিত হবে, যার দরুন প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে এবং নিজের প্রত্যেকটি বস্তুতেই, "আল্লাহর মালিকানা" বলে মনে করবে, প্রত্যেকটি মানুষ সেই এক আল্লাহকেই নিজের এবং সমগ্র পৃথিবীর একই সঙ্গত মালিক, মাবুদ, প্রভু অনুসরণযোগ্য এবং আদেশ-নিষেধের নিরঙ্কুশ অধিকারী বলে মেনে নিবে। মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য জীবনব্যবস্থার উৎস একমাত্র তাকেই স্বীকার করবে এবং আল্লাহর আনুগত্য বিমূখতা কিংবা তার জীবন বিধান উপেক্ষা করা অথবা আল্লাহর নিজ সত্তা ও গুণ-গরিমা এবং অধিকার ও ক্ষমতায় অন্যের অংশীদারিত্ব যেদিক দিয়ে এবং যেরূপেই রয়েছে, তা মারাত্মক ভ্রান্তি ও গোমরাহী হবে এই নিগূঢ় সত্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এই প্রাসাদ অত্যধিক সুদৃঢ় হওয়া ঠিক তখনই সম্ভব, যখন কোনো ব্যক্তি পরিপূর্ণ চেতনা ও ইচ্ছা সহকারে তার নিজ সত্তা, যাবতীয় ধনপ্রাণ নিঃশেষে আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। নিজের মনগড়া-ভালো মন্দের মানদণ্ড চূর্ণ করে সর্বতোভাবে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তোষ ও অসন্তোষকেই একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করবে। নিজের স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করে নিজস্ব মতবাদ, চিন্তাধারা, মনোবাসনা, মানসিক ভাবধারা ও চিন্তাপদ্ধতিকে একমাত্র আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের (কুরআনের) আদর্শে ঢেলে গঠন করবে। যেসব কাজ সুসম্পন্ন করার মারফত আল্লাহর আনুগত্য করা হয় না, বরং যাতে আল্লাহর নাফরমানী করা হয় তা সবকিছুই পরিত্যাগ করবে। নিজের হৃদয়-মনের সর্বোচ্চ স্থানে অভিষিক্ত করবে আল্লাহর প্রেম–আল্লাহর ভালোবাসাকে এবং মনের মণিকোঠা হতে আল্লাহ অপেক্ষা প্রিয়তর 'ভূত' যেখানে যেখানে আছে, তা আতিপাতি করে খুঁজে বের করবে এবং তাকে চূর্ণ করবে। নিজের প্রেম-ভালোবাসা, নিজের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, নিজের আগ্রহ ও ঘৃণা, নিজের সন্ধি ও যুদ্ধ সবকিছুকেই আল্লাহর মর্জির অধীন

করে দিবে ফলে মন শুধু তাই পেতে চাইবে যা আল্লাহ পছন্দ করেন, যা আল্লাহ পছন্দ করেন না তা হতে মন দূরে পলায়ন করতে চেষ্টা করবে। বস্তুত আল্লাহর প্রতি ঈমানের এটাই হচ্ছে নিগূঢ় অর্থ। অতএব যেখানে ঈমানই এই সর্বদিক দিয়ে গভীর, ব্যাপক ও সুদৃঢ় এবং পরিপক্ক না হবে, সেখানে তাকওয়া ও ইসলাম যে হতে পারে না তা সকলেই বুঝতে পারেন। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, বাহ্যিক আবয়ব এবং পোশাকের কাটছাট অথবা তাসবীহ পাঠ ও তাহাজ্জুদ নামায ইত্যাদি দ্বারা ঐরূপ ঈমানের অভাব কি কখনো পূর্ণ হতে পারে?

এই দৃষ্টিতে ঈমানের অন্যান্য দিকগুলো সম্পর্কেও চিন্তা করে দেখা যেতে পারে। মানুষ যতোক্ষণ পর্যন্ত জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে ও ব্যাপারে নবীকে একমাত্র নেতা ও পথ প্রদর্শকরূপে মেনে না নিবে এবং তাঁর নেতৃত্ব বিরোধী কিংবা এর প্রভাবমুক্ত যত নেতৃত্বই দুনিয়াতে প্রচলিত হবে, তার সবগুলোকেই যতোক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যাহার না করবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত রাসূলের প্রতি ঈমান কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না। আল্লাহর কিতাব প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা ও নীতিসমূহ ছাড়া অন্য কোনো আদর্শের প্রতিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হওয়ার এক বিন্দুভাব বর্তমান থাকলে কিংবা আল্লাহর নাযিলকৃত ব্যবস্থাকে নিজের ও সমগ্র পৃথিবীর জীবন বিধানরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখার জন্য মনের ব্যাকুলতার কিছুমাত্র অভাব পরিলক্ষিত হলে আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান আনা হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে না, সে ঈমান বাস্তবিকই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অনুরূপভাবে পরকালের প্রতি ঈমান ও পূর্ণতা লাভ করতে পারে না যতোক্ষণ না মানুষের মন অকুণ্ঠভাবে পরকালকে ইহকালের উপর প্রাধান্য ও গুরুত্ব দান করবে। পরকালীন কল্যাণের মূল্যমানকে ইহকালীন কল্যাণের মূল্যমান অপেক্ষা অধিকতর গ্রহণযোগ্য– শেষোক্তটিকে প্রথমটির মোকাবিলায় প্রত্যাখ্যানযোগ্য বলে মনে করবে এবং যতোক্ষণ পর্যন্ত না পরকালে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করার বিশ্বাস তার জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপেই তাকে ভাবতে ও সংযত করে তুলবে। বস্তুত এই মূল ভিত্তিসমূহই যেখানে পূর্ণ হবে না, সুদৃঢ় ও ব্যাপক হবে না, সেখানে ইসলামী জিন্দেগীর বিরাট প্রাসাদ কিসের উপর দাঁড় করানো যেতে পারে, তা কি একবারও চিন্তা করে দেখেছেন? কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক যখন এই ভিত্তিসমূহের পূর্ণতা, ব্যাপকতা ও পরিপক্কতা সাধন ছাড়াই ইসলামী নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে মনে করলো, তখন ইসলামী সমাজে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা গেলো।

দেখা গেলো আল্লাহর কিতাবের সম্পূর্ণ বিপরীত রায় দানকারী বিচারপতি; শরীয়াত বিরোধী আইনের ভিত্তিতে ব্যবসায়ী ও উকিল; কাফেরী সমাজব্যবস্থা অনুযায়ী জীবনের কাজ-কর্ম সম্পন্নকারী কর্মী; কুফরী আদর্শের তমদ্দুন ও রাষ্ট্রব্যবস্থানুযায়ী জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টানুবর্তী নেতা ও জনতা সকলের জন্যই তাকওয়া ও ইহসানের উচ্চতম পর্যায়সমূহ হাসিল করা একেবারে সহজ হয়ে গেলো। সকলেরই জন্য এর দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেলো। আর তাদের জীবনের বাহ্যিক বেশ-ভূষা ধরণ-ধারণ ও আচার-অনুষ্ঠানকে একটি বিশেষ ধরনে গঠন করা এবং কিছু নফল নামায, রোযা ও যিকির-আয্কারের অভ্যাস করাই সেজন্য যথেষ্ট বলে মনে করা হলো।

ইসলাম

ঈমানের উপরোক্ত ভিত্তিসমূহ যখন বাস্তবিকই পরিপূর্ণ ও দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। তখনই তার উপর ইসলামের দ্বিতীয় অধ্যায় রচনা করার কাজ শুরু হয়। বস্তুত ইসলাম হচ্ছে ঈমানেরই বাস্তব অভিব্যক্তি– ঈমানেরই কর্মরূপ। ঈমান ও ইসলামের পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক বীজ ও বৃক্ষের পারস্পরিক সম্পর্কের অনুরূপ। বীজের মধ্যে যা কিছু যেভাবে বর্তমান থাকে, তাই বৃক্ষের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এমনকি, বৃক্ষের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে বীজের মধ্যে কী ছিলো, আর কী ছিলো না, তা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। বীজ না হওয়া সত্ত্বেও বৃক্ষের অস্তিত্ব যেমন কেউ ধারণা করতে পারে না, অনুরূপভাবে এটাও ধারণা করা যায় না যে, জমি বন্ধ্যা ও অনুর্বর নয় এমন জমিতে বীজ বপন করলে বৃক্ষ অঙ্কুরিত হবে না। প্রকৃতপক্ষে ঈমান ও ইসলামের অবস্থা ঠিক এরূপ। যেখানে বস্তুতই ঈমানের অস্তিত্ব থাকবে, সেখানে ব্যক্তির বাস্তব জীবনে, কর্মজীবনে, নৈতিকতায়, গতিবিধিতে, রুচি ও মানসিক ঝোঁক-প্রবণতায় স্বভাব-প্রকৃতিতে, দুঃখ-কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকারের দিকে ও পথে, সময়, শক্তি এবং যোগ্যতার বিনিয়োগ জীবনের প্রতিটি দিকে ও বিভাগে, প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারেই এর বাস্তব অভিব্যক্তি ও বহিঃপ্রকাশ হবেই হবে। উল্লেখিত দিকসমূহের মধ্যে কোনো একটি দিকেও যদি ইসলামের পরিবর্তে ইসলাম বিরোধী কার্যক্রম ও ভাবধারা প্রকাশ হতে দেখা যায়, তবে নিঃসন্দেহে মনে করতে হবে যে, সেই দিকটি ঈমান শূন্য অথবা তা থাকলেও একেবারে নিঃসার, নিস্তেজ ও অচেতন হয়ে রয়েছে যা থাকা বা না থাকা উভয়ই সম্পূর্ণ সমান। আর বাস্তব কর্মজীবন

যদি সম্পূর্ণরূপে অমুসলিমদের ধারা-পদ্ধতিতে যাপিত হয়, তবে তার মনে ঈমানের অস্তিত্ব নেই। কিংবা থাকলেও তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত অনুর্বর ও উৎপাদন শক্তিহীন হওয়ার কারণে ঈমানের বীজই তথায় অঙ্কুরিত হতে পারে নি বলে মনে করতে হবে। যা হোক, আমি কুরআন ও হাদীস যতোদূর বুঝতে পেরেছি তার উপরে নির্ভর করে বলতে পারি যে, মনের মধ্যে ঈমান বর্তমান থাকা এবং কর্মজীবনে ইসলামের বাস্তব প্রকাশ না হওয়া একেবারেই অসম্ভব ও অস্বাভাবিক।

(এই সময় একজন শ্রোতা দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, ঈমান ও আমলকে কি আপনি একই জিনিস বলে মনে করেন? অথবা এই দু'টির মধ্যে আপনার দৃষ্টিতে কোনো পার্থক্য আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে মাওলনা মওদূদী বলেন)

এ সম্পর্কে ফিকাহ শাস্ত্রকার ও কালাম শাস্ত্রবিদদের উত্থাপিত বিতর্ক অল্প সময়ের জন্য মন হতে দূরে রেখে সরাসরিভাবে কুরআন মজীদ হতে এই প্রশ্নের উত্তর পেতে চেষ্টা করুন। কুরআন হতে সুস্পষ্টরূপে জানতে পারা যায় যে, বিশ্বাসগত ঈমান ও বাস্তব কর্মজীবনের ইসলাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে ঈমান ও সৎকাজের (আমলে সালেহ) একই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সকল ভালো ভালো প্রতিশ্রুতি কেবল সেই বান্দাদের জন্য যারা বিশ্বাসের দিক দিয়ে ঈমানদার এবং বাস্তব কর্মের দিক দিয়ে পূর্ণরূপে 'মুসলিম'। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা যেসব লোককে 'মুনাফিক, বলে নির্দিষ্ট করেছেন তাদের বাস্তব কর্মের দোষ-ত্রুটির ভিত্তিতেই তাদের ঈমানের অন্তসারশূন্যতা প্রমাণ করেছেন এবং বাস্তব কর্মগত ইসলামকেই প্রকৃত ঈমানের লক্ষণ বলে নির্দিষ্ট করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, আইনত কাউকে 'কাফের' ঘোষণা করা এবং মুসলিম জাতির সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং সে ব্যাপারে অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। কিন্তু পৃথিবীতে শাস্ত্রীয় আইন প্রযুক্ত হতে পারে যে ঈমান ও ইসলামের উপর, এখানে আমি সেই ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করছি না। বরং যে ঈমান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য এবং পরকালীন ফলাফল যার ভিত্তিতেই মীমাংসিত হবে এখানে আমি কেবল সেই ঈমান সম্পর্কেই বলছি। আইনগত দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করে প্রকৃত ব্যাপার ও নিগূঢ় সত্যটি যদি আপনি জানতে চেষ্টা

করেন, তবে নিশ্চিতরূপেই দেখতে পাবেন যে, কার্যত যেখানে সামনে আত্মসমর্পণ, আত্মোৎসর্গ ও পরিপূর্ণরূপে আত্মাহুতির অভাব রয়েছে, যেখানে নিজ মনের ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে মিশে একাকার হয়ে যায় নি– পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে, যেখানে আল্লাহর অনুগত্য করে চলার সঙ্গে সঙ্গে কার্যত 'অন্য শক্তির'ও আনুগত্য করা হচ্ছে, যেখানে আল্লাহর দীন ইসলাম কায়েম করার উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনার পরিবর্তে অন্যান্য কাজের দিকেই মনের ঝোক ও আন্তরিক নিষ্ঠা রয়েছে, যেখানে আল্লাহর নির্দিষ্ট পথে চেষ্টা-সাধনা এবং দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করা হচ্ছে না, বরং এ সবকিছুই হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে– ভিন্ন উদ্দেশ্যে, সেখানে যে ঈমানের মৌলিক ত্রুটি রয়েছে তাতে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না। আর অসম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ ঈমানের উপর তাকওয়া ও ইহসানের অধ্যায় যে রচিত হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। বাহ্যিক বেশ-ভূষার তাকওয়া কিংবা ইহসানের কৃত্রিম অনুকরণের চেষ্টা করলেও এর প্রকৃত ভাবধারা লাভ করা সম্ভব নয়। বাহ্যিক বেশ-ভূষা ও কৃত্রিম আচার-অনুষ্ঠান সাধারণত অন্তসারশূন্য হলে এবং অন্তর্নিহিত ভাবধারার সাথে বাহ্যিক বেশ-ভূষার সামঞ্জস্য না হলে তা একটি সুশ্রী ও সুঠাম মৃতদেহের অনুরূপ হয়ে থাকে। এর বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও বেশ-ভূষা যতোই সুন্দর ও উত্তম হোক না কেন, তা প্রাণশূন্য বলে জনগণ তা দেখে প্রতারিত হতে পারে মাত্র। এই বাহ্যিক বেশ ভূষা ও সুঠাম দেহের প্রতি কোনো কাজের আশা করে থাকলে বাস্তব ঘটনাই তার ব্যর্থতা প্রমাণ করবে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে নিঃসন্দেহে জানতে পারা যাবে যে, একজন কৃষ্ণকায় জীবিত মানুষ একটি সুশ্রী লাশ অপেক্ষা অধিক কার্যকরী হয়ে থাকে। প্রকাশ্য বেশ-ভূষার দ্বারা নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া ও আত্মপ্রতারণা করা সহজ বা সম্ভব, কিন্তু বাস্তব পরীক্ষায় এর কোনো মূল্যই প্রমাণিত হয় না– আল্লাহর নিকট এর একবিন্দু মূল্য হওয়া তো দূরের কথা। অতএব বাহ্যিক নয়, প্রকৃত ও আন্তরিক নিষ্ঠাপূর্ণ তাকওয়া ও ইহসান লাভ করতে হলে– আর এটা ছাড়া দুনিয়ার বুকে আল্লাহর দীনের প্রতিষ্ঠা এবং পরকালীন কল্যাণ লাভ মাত্রই সম্ভব নয়– আমার একথা মনের পৃষ্ঠায় বদ্ধমূল করে নিন যে, উপরের এ দু'টি পর্যায় কিছুতেই গড়ে উঠতে পারে না, যতোক্ষণ না ঈমানের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় হবে। আর যতোক্ষণ পর্যন্ত কর্মগত ইসলাম কার্যত আল্লাহর আনুগত্য ও অনুসরণের ভিতর দিয়ে নিঃসন্দেহে বাস্তব প্রমাণ পাওয়া না যাবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের ভিত্তি মজবুত হতে পারে না।

তাকওয়া

তাকওয়া সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার পূর্বে 'তাকওয়া' কাকে বলে তা জেনে নেওয়া আবশ্যক। তাকওয়া কোনো বাহ্যিক ধরণ-ধারণ এবং বিশেষ কোনো সামাজিক আচারণ অনুষ্ঠানের নাম নয়। তাকওয়া মূলত মানব মনের সেই অবস্থাকেই বলা হয় যা আল্লাহর গভীর ভীতি ও প্রবল দায়িত্বানুভূতির দরুন সৃষ্টি হয় এবং জীবনের প্রত্যেকটি দিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের মনে আল্লাহর ভয় হবে, নিজে আল্লাহর দাসানুদাস– এই চেতনা জাগ্রত থাকবে, আল্লাহর সামনে নিজের দায়িত্ব ও জবাবদিহি করার কথা স্মরণ থাকবে এবং এই একটি পরীক্ষাগারে আল্লাহ জীবনের একটি নির্দিষ্ট আয়ু দান করে এখানে পাঠিয়েছে, এই খেয়াল তীব্রভাবে বর্তমান থাকবে। পরকালে ভবিষ্যতের ফায়সালা এই দৃষ্টিতে হবে যে, এই নির্দিষ্ট অবসরকালের মধ্যে এই পরীক্ষাগারে নিজের শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতা কীভাবে প্রয়োগ করেছে, আল্লাহর ইচ্ছানুক্রমে যেসব দ্রব্যসামগ্রী লাভ করতে পেরেছে, তার ব্যবহার কীভাবে করেছে এবং আল্লাহর নিজস্ব বিধান অনুযায়ী জীবনকে বিভিন্ন দিক দিয়ে যেসব মানুষের সাথে বিজড়িত করেছে, তাদের সাথে কীরূপ কাজ-কর্ম ও লেন-দেন করা হয়েছে– একথাটিও মনের মধ্যে জাগরুক থাকবে।

বস্তুত এরূপ অনুভূতি ও চেতনা যার মধ্যে তীব্রভাবে বর্তমান থাকবে, তার হৃদয়-মন জাগ্রত হবে, তার ইসলামী চেতনা তেজস্বী হবে, আল্লাহর মর্জির বিপরীত প্রত্যেকটি বস্তুই তার মনে খটকার সৃষ্টি করবে, আল্লাহর অননুমোদিত প্রত্যেকটি জিনিসই তার রুচিতে অসহ্য হয়ে উঠবে, তখন সে নিজেই নিজের যাচাই করবে। তার হৃদয়-মনে কোন ধরনের ঝোঁক ও ভাবধারা লালিত-পালিত হচ্ছে নিজেই তার জরিপ করবে। সে কোন্ সব কাজ-কর্মে নিজের সময় ও শক্তি ব্যয় করছে তার হিসেব সে নিজেই করতে শুরু করবে। তখন সুস্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ কোনো কাজ করা দূরের কথা সংশয়পূর্ণ কোনো কাজেও লিপ্ত হতে সে নিজে ইতস্তত করবে। তার অন্তর্নিহিত কর্তব্যজ্ঞানই তাকে আল্লাহর সমস্ত নির্দেশ পূর্ণ আনুগত্যের সাথে পালন করতে বাধ্য করবে। যেখানেই আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমালঙ্ঘন হওয়ার আশঙ্কা হবে, সেখানেই তার অন্তর্নিহিত আল্লাহভীতি তার পদযুগলে প্রবল কম্পন সৃষ্টি করবে– চলৎশক্তি রহিত করে দিবে। আল্লাহর হক ও মানুষের হক রক্ষা করা স্বতঃস্ফূর্ত রূপেই তার স্বভাবে

পরিণত হবে। কোথাও সত্যের বিপরীত কোনো কথা বা কাজ তার দ্বারা না হয়ে পড়ে সেই ভয়ে তার মন সতত কম্পমান থাকবে। এরূপ অবস্থা বিশেষ কোনো ধরনের কিংবা বিশেষ কোনো পরিধির মধ্যে পরিলক্ষিত হবে না, ব্যক্তির সমগ্র চিন্তা-পদ্ধতি এবং তার সমগ্র জীবনের কর্মধারাই এর বাস্তব অভিব্যক্তি হবে। এর অনিবার্য প্রভাবে এমন এক সুসংবদ্ধ সহজ, ঋজু এবং একই ভাবধারা বিশিষ্ট ও পরম সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকৃতি গঠিত হবে, যাতে সর্বদিক দিয়েই একই প্রকারের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ফুটে উঠবে। পক্ষান্তরে কেবল বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও কয়েকটি নির্দিষ্ট পথের অনুসরণ এবং নিজেকে কৃত্রিমভাবে কোনো পরিমাপযোগ্য ছাঁচে ঢেলে নেওয়াকেই যেখানে তাকওয়া বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, সেখানে শিখিয়ে দেওয়া কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ ধরন ও পদ্ধতিতে 'তাকওয়া' পালন হতে দেখা যাবে, কিন্তু সেই সঙ্গে জীবনের অন্যান্য দিকে ও বিভাগে এমনসব চরিত্র, চিন্তা-পদ্ধতি ও কর্মনীতি পরিলক্ষিত হবে, যা 'তাকাওয়া' তো দূরের কথা ঈমানের প্রাথমিক স্তরের সাথেও এর কোনো সামঞ্জস্য হবে না। এটাকেই হযরত ঈসা আ. উদাহরণের ভাষায় বলেছেন– "এক দিকে মাছি বলে বাহির করো আর অন্যদিকে বড়ো বড়ো উট অবলীলাক্রমে গলধকরণ করো।"

প্রকৃত তাকওয়া এবং কৃত্রিম তাকওয়ার পারস্পরিক পার্থক্য অন্যভাবেও বুঝতে পারা যায়। যে ব্যক্তির মধ্যে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার একটি তীব্র ও জাগ্রত রুচি অনুভূতি বর্তমান রয়েছে সে নিজেই অপবিত্রতা ও পঙ্কিলতাকে ঘৃণা করবে তা যে অকারেই হোক না কেনো এবং পবিত্রতাকে পূর্ণরূপে ও স্থায়ীভাবে গ্রহণ করবে। তার বাহ্যিক অনুষ্ঠান যথাযথভাবে প্রতিপালিত না হলেও কোনো আপত্তি থাকবে না। অপর ব্যক্তির আচরণ এর বিপরীত হবে। কারণ, পবিত্র ও পরিচ্ছন্নতার কোনো স্বতঃস্ফূর্ত চেতনা তার মধ্যে নেই বরং ময়লা ও অপবিত্রতার একটি তালিকা কোথা হতে লিখে নিয়ে সবসময়ই সঙ্গে রেখে চলে, ফলে এই ব্যক্তি তার তালিকায় উল্লেখিত ময়লাগুলো হতে নিশ্চয় আত্মরক্ষা করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা অপেক্ষা অধিক জঘন্য ও ঘৃণিত বহু প্রকার পঙ্কিলতার মধ্যে সে অজ্ঞাতসারেই লিপ্ত হয়ে পড়বে, তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। কারণ, তালিকায় অনুল্লেখিত পঙ্কিলতা যে কোনোরূপ পঙ্কিল বা ঘৃণিত হতে পারে এটা সে মাত্রই বুঝতে পারে না। এই পার্থক্য কেবল নীতিগত ব্যাপারেই নয়, চারদিকে যাদের তাকওয়ার একেবারে ধুম পড়ে গেছে তাদের জীবনে

এই পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। তারা একদিকে শরীয়াতের খুঁটিনাটি বিষয়ে খুবই কড়াকড়ি করে থাকে, এমনকি দাঁড়ির দৈর্ঘ্য একটি বিশেষ পরিমাপ হতে একটু কম হলেই তাকে জাহান্নামী হওয়ার 'সুসংবাদ' শুনিয়ে দিতে সঙ্কোচবোধ করে না এবং ফিকাহর শাস্ত্রীয় মত হতে কোথাও সামান্য বিচ্যুতিকেও তারা দীন ইসলামের সীমালঙ্ঘন করার সমান মনে করে। কিন্তু অন্যদিকে ইসলামের মূলনীতি ও বুনিয়াদী আদর্শকে তারা চরমভাবে উপেক্ষা করে চলে। গোটা জীবনের ভিত্তি তারা স্থাপিত করেছে 'রোখছত' অনুমতি ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদী নীতির উপর। আল্লাহর দীন ইসলাম কায়েম করার জন্য চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রাম করার দায়িত্ব এড়ানোর জন্য তারা বহু সুযোগের পথ আবিষ্কার করে নিয়েছে। কুফরী রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে তারা ইসলামী জিন্দেগী যাপন করার জন্যই সমস্ত চেষ্টা ও সাধনা নিযুক্ত করে রেখেছে। শুধু তা-ই নয়, তাদেরই ভুল নেতৃত্ব মুসলমানদেরকে একথা বুঝিয়েছে যে, এক ইসলাম বিরোধী সমাজব্যবস্থার অধীন থেকে বরং এর 'খিদমত' করেও সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে ধর্মীয় জীবন-যাপন করা যায় এবং তাতেই দীন ইসলামের যাবতীয় নির্দেশ পরিপালিত হয়ে যায়– অতঃপর ইসলামের জন্য তাদেরকে আর কোনো চেষ্টা-সাধনা বা কষ্ট স্বীকার আদৌ করতে হবে না। এটা অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখের কথা এই যে, তাদের সামনে দীন ইসলামের মূল দাবি যখন পেশ করা হয় এবং দীন (ইসলামী নেজাম) কায়েম করার চেষ্টা-সাধনা ও আন্দোলনের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তখন তারা এর প্রতি শুধু চরম উপেক্ষাই প্রদর্শন করে না, এটা হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং অন্যান্য মুসলমানকেও তা হতে বিরত রাখার জন্য শত রকমের কৌশলের আশ্রয় নেয়। আর এতোসব সত্ত্বেও তাদের 'তাকওয়া' ক্ষুণ্ণ হয় না, আর ধর্মীয় মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোকদের মনে তাদের 'তাকওয়ার' অন্তসারশূন্যতা সম্পর্কে সন্দেহ মাত্র জাগ্রত হয় না। এভাবেই প্রকৃত ও নিষ্ঠাপূর্ণ 'তাকওয়া' এবং কৃত্রিম ও অন্তসারশূন্য 'তাকওয়ার' পারস্পরিক পার্থক্য বিভিন্নরূপে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। কিন্তু তা অনুভব করার জন্য 'তাকওয়ার' প্রকৃত ধারণা মনের মধ্যে পূর্বেই বদ্ধমূল হওয়া অপরিহার্য।

কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ, চলাচল, উঠাবসা ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের বাহিক্যরূপ যা হাদিস হতে প্রমাণিত হয়েছে তাকে আমি হীন ও অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করি, আমার পূর্বোক্ত আলোচনা হতে সেরূপ

ধারণা করা মারাত্মক ভুল হবে সন্দেহ নেই। এরূপ কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না। বস্তুত আমি শুধু একথাই বোঝাতে চাই যে, প্রকৃত তাকওয়াই হচ্ছে আসল গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, তার বাহ্যিক প্রকাশ মূখ্য নয়, গৌণ। আর প্রকৃত 'তাকওয়ার' মহিমা দীপ্তি যার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠবে, তার সমগ্র জীবনই পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের সাথে খাঁটি 'ইসলামী' জীবন-রূপেই গড়ে উঠবে এবং তার চিন্তাধারায়, মতবাদে, তার হৃদয়াবেগ ও মনের ঝোঁক প্রবণতায়, তার স্বভাবগত রুচি তার সময় বণ্টন ও শক্তিনিচয়ের ব্যয়-ব্যবহার তার চেষ্টা-সাধনার পথ পন্থায়, তার জীবনধারায় ও সমাজ পদ্ধতিতে, তার আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে, তার সমগ্র পার্থিব ও বৈষয়িক জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগে পূর্ণ ব্যাপকতা ও সামগ্রিকতার সাথে ইসলাম রূপায়িত হতে থাকবে। কিন্তু আসল তাকওয়া অপেক্ষা তার বাহ্যিক বেশ-ভূষাকেই যদি প্রাধান্য দেওয়া হয়, তার উপরই যদি অযথা গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং প্রকৃত তাকওয়ার বীজ বপন ও তার পরিবর্তনের জন্য যত্ন না নিয়ে যদি কৃত্রিম উপায়ে কয়েকটি বাহ্যিক হুকুম-আহকাম পালন করানো হয়, তবে বর্ণিত রূপেই যে এর পরিণাম ফল প্রকাশিত হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। প্রথমোক্ত কাজ অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ, সেই জন্য অসীম ধৈর্য্যের আবশ্যক; ক্রমবিকাশের নীতি অনুসারেই তা বিকশিত হয় এবং দীর্ঘ সময়ের সাধনার পরই তা সুশোভিত হয়ে থাকে ঠিক যেমন একটি জীব হতে বৃক্ষ সৃষ্টি এবং তাতে ফুল এবং ফল ধারণে স্বভাবতই বহু সময়ের আবশ্যক হয়। এ কারণেই স্থূল ও অস্থির স্বভাবের লোক ঐরূপ তাকওয়া লাভ করার জন্য চেষ্টা করতে সাধারণত প্রস্তুত হয় না। দ্বিতীয় প্রকার তাকওয়া, তাকওয়ার বাহ্যিক বেশ ভূষা, সহজলভ্য, অল্প সময় সাপেক্ষ। যেমন একট কাষ্ঠখণ্ডের পত্র ও ফুল ফল বেঁধে "ফুল ফলে শোভিত একটি বৃক্ষ" দাঁড় করানো হয়তো বা সহজ; কিন্তু মূলত তা কৃত্রিম, প্রতারণামূলক এবং ক্ষণস্থায়ী। এজন্যই আজ শেষোক্ত প্রকারের তাকওয়াই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু একটি স্বাভাবিক বৃক্ষ হতে যা কিছু লাভ করার আশা করা যায়; একটি কৃত্রিম বৃক্ষ হতে তা কিছুতেই সম্ভব নয়; এটা সর্বজনবিদিত সত্য।

ইহসান

এখন 'ইহসান' সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। পূর্বেই বলা হয়েছে, এটা ইসলামী জীবন প্রাসাদের সর্বোচ্চ মঞ্জিল, সর্বোচ্চ পর্যায়। মূলত 'ইহসান' বলা হয় : আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তার ইসলামের সাথে মনের এমন

গভীরতম ভালোবাসা, দুশ্ছেদ্যবন্ধন ও আত্মহারা প্রেম পাগল ভাবধারাকে, যা একজন মুসলমানকে 'ফানা ফিল ইসলাম'– 'ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গীকৃত প্রাণ' করে দিবে। তাকওয়ার মূল কথা হচ্ছে আল্লাহর ভয়, যা আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ হতে দূরে সরে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। আর ইহসানের মূলকথা হচ্ছে আল্লাহর প্রেম আল্লাহর ভালোবাসা। এটা মানুষকে আল্লাহর সন্তোষ লাভ করার জন্য সক্রিয় করে তোলে। এ দু'টি জিনিসের পারস্পরিক পার্থক্য একটি উদাহরণ হতে বোঝা যায়। সরকারি চাকুরীজীবিদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক লোক থাকে, যারা নিজ নিজ নির্দিষ্ট দায়িত্ব, কর্তব্যানুভূতি ও আগ্রহ উৎসাহের সাথে যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়। সমগ্র নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে তারা চলে এবং সরকারের দৃষ্টিতে আপত্তিকর কোনো কাজই তারা কখনো করে না। এ ছাড়া আর এক ধরনের লোক থাকে, যারা ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আন্তরিক ব্যগ্রতা ও তিতিক্ষা এবং আত্মোৎসর্গপূর্ণ ভাবধারার সাথেই সরকারের কল্যাণ কামনা করে। তাদের উপর যেসব কাজ ও দায়িত্ব অর্পিত হয়, তারা কেবল তাই সম্পন্ন করে না, যেসব কাজে রাষ্ট্রের কল্যাণ ও উন্নতি হতে পারে আন্তরিকতার সাথে সেইসব কাজও তারা আঞ্জাম দেবার জন্য যত্নবান হয় এবং এজন্য তারা আসল কর্তব্য ও দায়িত্ব অপেক্ষা অনেক বেশি কাজ করে থাকে। রাষ্ট্রের ক্ষতিকর কোনো ঘটনা ঘটে বসলেই তারা নিজেদের জানমাল ও সন্তান সবকিছুই উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হয়। কোথাও আইন-শৃঙ্খলা লঙ্ঘিত হতে দেখলে তাদের মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। কোথাও রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও বিদ্রোহ ঘোষণার লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হলে তারা অস্থির হয়ে পড়ে এবং তা দমন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। নিজে সচেতনভাবে রাষ্ট্রের ক্ষতি করা তো দূরের কথা তার স্বার্থে সামান্য আঘাত লাগতে দেওয়া তাদের পক্ষে সহ্যাতীত হয়ে পড়ে এবং সকল প্রকার দোষত্রুটি দূর করার ব্যাপারে সাধ্যানুসারে চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না। পৃথিবীর সর্বত্র একমাত্র তাদের রাষ্ট্রের জয়জয়কার হোক এবং সর্বত্রই এরই বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়ে পত পত করতে থাকুক– এটাই হয় এই শ্রেণির সরকারি কর্মচারীদের মনের বাসনা। এই দু'য়ের মধ্যে প্রথমোক্ত কর্মচারীগণ হয় রাষ্ট্রের 'মুত্তাকী' আর শেষোক্ত কর্মচারীগণ হয় 'মুহসীন'। উন্নতি এবং উচ্চপদ মুত্তাকীরাও লাভ করে থাকে, বরং যোগ্যতম কর্মচারীদের তরিকায় তাদেরই নাম বিশেষভাবে লিখিত থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'মুহসিনদের' জন্য সরকারের নিকট যে সম্মান ও মর্যাদা

হয়ে থাকে, তাতে অন্য কারোই অংশ থাকতে পারে না। ইসলামে 'মুত্তাকী' ও 'মুহসীনদের' পারস্পরিক পার্থক্য উক্ত উদাহরণ হতে সুস্পষ্টরূপে বোঝতে পারা যায়। ইসলামে মুত্তাকীদের যথেষ্ট সম্মান রয়েছে, তারাও শ্রদ্ধাভাজন সন্দেহ নেই। কিন্তু ইসলামের আসল শক্তি হচ্ছে মুহসিনগণ। আর পৃথিবীতে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য একমাত্র 'মুহসিনদের' দ্বারাই সুসম্পন্ন হতে পারে।

ইহসান এর নিগূঢ় তত্ত্ব জেনে নেওয়ার পর প্রত্যেক পাঠকই অনুমান করতে পারেন যে, যারা আল্লাহর দীন ইসলামকে কুফরের অধীন-কুফর কর্তৃক প্রভাবান্বিত দেখতে পায়, যাদের সামনে আল্লাহ নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘিত ও পর্যুদস্তই শুধু নয়-নিঃশেষে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা হয়, আল্লাহর বিধান কেবল কার্যতই নয়– সর্বতোভাবেই বাতিল করে দেওয়া হয়, আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর পরিবর্তে আল্লাহদ্রোহীদের 'রাজত্ব' ও প্রভাব স্থাপিত হয়, কুফরী ব্যবস্থার আধিপত্যে কেবল জনসমাজেই নৈতিক ও তমদ্দুনিক বিপর্যয় উদ্ভূত হয় না, স্বয়ং মুসলিম জাতিও অত্যন্ত দ্রুততার সাথে নৈতিক ও বাস্তব কর্মগত ভুলভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, সেখানে এসব প্রত্যক্ষ করার পরও যাদের মনে একটু ব্যথা, দুঃখ বা চিন্তা জেগে ওঠে না, এই অবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য উদ্যম ও প্রয়োজনীয়তাবোধই যাদের মধ্যে জাগ্রত হয় না, বরং যারা নিজেদের মনকে এবং মুসলমান জনসাধারণকে ইসলাম বিরোধী জীবনব্যবস্থার প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠাকে নীতিগত ও কার্যত বরদাশত করার জন্য সান্ত্বনা দেয়; এই শ্রেণির লোকদেরকে 'মুহসিন' বলে কীরূপে মনে করা যেতো পারে, তা বুঝতে পারি না। আরো আশ্চর্যের বিষয়, এই মারাত্মক অপরাধ ও গোনাহ করা সত্ত্বেও কেবল চাশত, এশরাক ও তাহাজ্জুদ প্রভৃতি নফল নামায পড়ার দরুন, যিকির-আযকার, মোরাকাবা-মুশাহিদা, কুরআন-হাদসির অধ্যাপনা, খুঁটিনাটি সুন্নাত পালনের দ্বারা মানুষ ইহসানের উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছতে পারে বলে মনে করা হয়।

سر داد نداد دست در دست یزید

"মস্তক দিয়েছি, কিন্তু ইযাজীদের হাতে হাত মিলাতে প্রস্তুত হইনি।"

এরূপ বিপ্লবী ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং আত্মোৎসর্গীভাব কোনো লোকের মধ্যেই ওঠে নি। এজন্যই–

بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا

"জয়লাভ হয় তো করি নি, নিজের মস্তক তো উৎসর্গ করতে পেরেছি।" বলে নিজেকে সত্যিকারভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করতে পারি নি।

দুনিয়ার বৈষয়িক রাষ্ট্র এবং জাতিসমূহের মধ্যেও নিষ্ঠাবান, অনুগত এবং অবাধ্য কর্মচারীদের মধ্যে বাস্তবক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দেশে বিদ্রোহ ঘোষিত হলে কিংবা দেশের কোনো অংশের উপর শত্রুপক্ষের আধিপত্য স্থাপিত হলে তখন যারা বিদ্রোহ ও শত্রুদের এই অন্যায় পদক্ষেপকে সঙ্গত বলে মনে করে, অথবা এতে সন্তোষ প্রকাশ করে এবং তাদের বিজিতের ন্যায় আচরণ করতে শুরু করেন, কিংবা তাদের প্রভুত্বাধীন এমন এক সমাজব্যবস্থা গঠন করে যার কর্তৃত্বের সমস্ত চাবিকাঠি শত্রুদের নিকট থাকবে, আর কিছু ছোটখাটো ব্যাপারে আবিষ্কার ও ক্ষমতা তারা নিজেরা লাভ করবে– কোনো রাষ্ট্র কিংবা জাতিই এই শ্রেণির লোকদেরকে অনুগত, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাগরিকরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না। জাতীয় পোশাক ও বাহ্যিক চালচলন কঠোরভাবে অনুসরণ করে চললেও এবং খুঁটিনাটি ব্যাপারে জাতীয় আইন দৃঢ়তার সাথে পালন করে চললেও এর কোনো মূল্যই দেওয়া হয় না। বর্তমান যুগের কতো ঘটনাকেই এর উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে পেশ করা যেতে পারে।

বিগত মহাযুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ে জার্মানি বহু দেশ দখল করেছিলো এবং সেই বিজিত দেশসমূহের অধিবাসীদের মধ্যে অনেক লোকই তাদের সাথে সহযোগিতা করেছিলো। কিন্তু পরবর্তীকালে এই দেশগুলো যখন জার্মান প্রভুত্ব হতে মুক্তি লাভ করলো তখন জার্মান প্রভুত্বের সাথে সহযোগিতাকারীদের প্রতি নির্মম ব্যবহার করা হয়েছে। এসব রাষ্ট্র ও জাতির নিকট নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য যাচাই করার একটি মাত্র মাপকাঠি রয়েছে। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ– শত্রুপক্ষের প্রভুত্ব বিলুপ্তির জন্য কে কতোখানি কাজ করেছে এবং যার প্রভুত্ব সে স্বীকার করে বলে দাবি করে, তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কে কতোখানি চেষ্টা ও সাধনা করেছে– নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য যাচাই করার এটাই হচ্ছে একমাত্র মানদণ্ড।

দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলোরই যখন এরূপ অবস্থা– সর্বপ্রকার আনুগত্যকে এই তীব্র শাণিত মানদণ্ডে যাচাই করে নেওয়াই যখন এদের রীতি, দুনিয়ার কমবুদ্ধির মানুষের ন্যায় নিজের নিষ্ঠাবান আনুগত্য ও অবাধ্যতাকে পরীক্ষা

করার জন্য আল্লাহর নিকট কি কোনো মানদণ্ড নেই? আল্লাহ তা'আলা কি শুধু শ্মশ্রুর দৈর্ঘ্য, লুঙ্গি-পায়জামার উর্ধ্বস্থতা, তাসবীহ পাঠ এবং দরূদ, অজীফা, নফল এবং মোরাকাবা প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ-কর্ম দেখে সন্তুষ্ট হবেন? আর নিজের খাঁটি ও নিষ্ঠাবান বান্দাহ বলে মনে করবেন? আল্লাহ সম্পর্কে এতো হীন ধারণা করা কি কোনোরূপেই সমীচীন হতে পারে?

ভুল ধারণার অপনোদন

উপসংহারে কয়েকটি জরুরি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। দীর্ঘকালের ভুল ধারণার কারণে সাধারণ মুসলমানের মনে খুঁটিনাটি কাজ ও বাহ্যিক অনুষ্ঠানসমূহের গুরুত্ববোধ তীব্র হয়ে রয়েছে। দীন ইসলামের মূলনীতি ও সামগ্রিক তথ্য এবং দীনদারী ও ইসলামী নেতিকতার নিগূঢ় ভাবধারার দিকে অসংখ্যবার তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তারা এর গুরুত্ব অনুভব করতে পারে না। লোকদের মন-মস্তিষ্কে ঘুরে-ফিরে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ ও সামান্য সামান্য বাহ্যানুষ্ঠানের গুরুত্বই তীব্র হয়ে ওঠে। তাদের দৃষ্টি এতো ক্ষুদ্র ও গুরুত্বহীন কাজগুলোর আন্তরালে গভীর সত্য পর্যন্ত পৌঁছায় না, বস্তুত ছোটো ছোটো ও ক্ষুদ্র কাজগুলোকেই দীন ইসলামের মূলভিত্তি বলে গণ্য করা হয়েছে। জামায়াতের বহু সদস্য এবং সমর্থকদের উপরও এই ভুল ধারণার মারাত্মক প্রভাব থাকতে পারে। দীন ইসলামের মূল তত্ত্ব ও প্রকৃত নিগূঢ় সত্য কী, তাতে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব কোন জিনিসের এবং কোনটি গৌণ এসব কথা সঠিকরূপে বোঝাবার জন্য আমি পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেছি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অনেকের মধ্যে সেই বাহ্যিক অনুষ্ঠানপ্রিয়তা এবং মূলনীতি অপেক্ষা খুঁটিনাটি ব্যাপারে গুরুত্বদানের সংক্রামক ব্যাধি তাদেরকে জর্জরিত করে দিয়েছে। জামায়াতের লোকদের দাড়ির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করার জন্য, পায়ের গিটের উপর উঠিয়ে পায়জামা পরার জন্য এবং এই ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে চাপ দেওয়ার জন্য আমাকে বারবার বলা হচ্ছে। কোনো কোনো লোক আবার 'জামায়াতে ইসলামীতে' 'মারেফাতের' অভাব অনুভব করছেন। কিন্তু মূলত মারেফাত কী জিনিস তারা নিজেরা হয়তো তা জানেন না। এজন্যই তারা আসল লক্ষ্য ও কর্মনীতি জামায়াতের ইসলামীরই ঠিক রেখে কোনো খানকাহ হতে আত্মশুদ্ধি সাধন ও আধ্যাত্মিক দীক্ষাদানের কার্যসূচী গ্রহণ করার প্রস্তাবও করছেন। এ দৃষ্টে মনে হয়, দীন ইসলামের প্রকৃত ধারণা এদের মনে আদৌ বর্তমান নেই।

একটু পূর্বেই আমি ঈমান, ইসলাম, তাকওয়া ও ইহসানের ব্যাখ্যা করেছি। এই ব্যাপারে কুরআন-হাদিসের বিপরীত কোনো কথা যদি আমি

বলে থাকি, তবে অকুণ্ঠভাবে এর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করুন। কিন্তু আপনি যদি স্বীকার করেন যে, কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী উক্ত চারটি জিনিসের মূলতত্ত্ব বর্ণিত রূপ ভিন্ন আর কিছু নয়, তবে যেখানে ঈমান তা যাবতীয় ব্যাপকতা ও গভীরতা সহকারে ফুটে ওঠে নি এবং যেখানে তাকওয়া ও ইহসানের মূল শিকড়ই বর্তমান নেই সেখানে কোনো প্রকারেই 'মারেফাত' (আধ্যাত্মিকতা) সন্ধান করে পাওয়া যেতে পারে না, তা আপনাদের নিজেদেরই চিন্তা করা উচিত। আর যেসব খুঁটিনাটি ও গৌণ বিষয়কে দীন ইসলামের প্রাথমিক ও মৌলিক দাবি বলে আপনারা ধরে নিয়েছেন সেগুলোর নিগূঢ় তত্ত্ব পুনরায় আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। আমি এই দিক দিয়ে আমার সমগ্র দায়িত্বই পূর্ণরূপে পালন করতে চাই।

সর্বপ্রথম শান্ত মনে এই প্রশ্নের জবাব নির্ধারণ করুন যে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে নবী কেন প্রেরণ করেন? দুনিয়াতে কোন বস্তুর অভাব রয়েছে, এখানে কোন ত্রুটি ও দোষ রয়ে গিয়েছিলো, যা দূরীভূত করার জন্য আল্লাহ নবীদের প্রেরণ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন। দুনিয়ার অধিবাসীগণ দাড়ি রাখতো না, তা রাখার জন্য কি আল্লাহ তা'আলা নবী পাঠিয়েছেন? কিংবা সব লোক পায়ের তালু পর্যন্ত ঝুলিয়ে পায়জামা বা লুঙ্গি পরিধান করতো বলে এটা বন্ধ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা নবী পাঠিয়েছেন? অথবা যেসব 'সুন্নাত' দেশময় প্রচলিত করার জন্য আপনারা ব্যস্ত হয়েছেন, তা যথাযথভাবে প্রতিপালিত করার জন্যই দুনিয়াতে নবীর আবির্ভাব অপরিহার্য হয়েছিলো? এসব প্রশ্ন সম্পর্কে একটু গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে আপনারা সকলেই স্বীকার করবেন যে, বস্তুত এটা কোনো মৌলিক দোষ-ত্রুটি নয়, নবী আগমনেরও এটা মূল উদ্দেশ্য হতে পারে না। তবে কোন্ মূল দোষ-ত্রুটির জন্য নবী আগমনের প্রয়োজনীয়তা হয়েছিলো? এই প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর হতে পারে এবং তা এই যে, আল্লাহর দাসত্ব বিমুখতা, ধর্মহীনতা, আল্লাহর আনুগত্য করে চলার প্রতি উপেক্ষা, নিজেদের মনগড়া নিয়ম-বিধানের অনুসরণ এবং আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করার অনিবার্যতা সম্পর্কে অবিশ্বাস– এগুলোই ছিলো দুনিয়ার মূলগত দোষ-ত্রুটি। এ কারণেই মানুষের নৈতিক চরিত্রে চরম ভাঙন ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছিলো। জীবন-যাপনের জন্য ভ্রান্ত রীতিনীতির প্রচলন হয়েছিলো, গোটা পৃথিবী চরম ধ্বংসের মুখে চলে গিয়েছিলো। বস্তুত মানুষের মধ্যে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করে চলার অকৃত্রিম নিষ্ঠা এবং আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করার প্রতি সন্দেহাতীত বিশ্বাস

সৃষ্টি করার জন্যই দুনিয়াতে আম্বিয়ায়ে কেরাম এসেছিলেন। উন্নত নৈতিক চরিত্রের বিকাশ সাধন এবং সুষ্ঠু মূলনীতির ভিত্তিতে মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা, কল্যাণের স্বতঃস্ফূর্ত ফল্গুধারা প্রবাহিত করা এবং অন্যায় ও পাপের সকল উৎস বন্ধ করাই তাদের মূল লক্ষ্য ছিলো। বস্তুত দুনিয়াতে নবীদের আগমনের এটাই ছিলো একমাত্র উদ্দেশ্য এবং এই বিরাট মহান উদ্দেশ্যের জন্যই এসেছিলেন সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ সা.।

এখন নবী করীম সা.-এর কর্মনীতি ও পদ্ধতি যাচাই করে দেখতে হবে, দেখতে হবে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি কোন্ ক্রমিক ও পর্যায়মূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন। সকলেই জানেন সর্বপ্রথম তিনি ঈমানের দাওয়াত পেশ করেছেন। অতঃপর এই ঈমানের অনিবার্য দাবি ও পরিণতি অনুযায়ী ক্রমশ শিক্ষা-দীক্ষাদানের সাহায্যে ঈমানদার লোকদের মধ্যে বাস্তব আনুগত্য অনুসরণ (অর্থাৎ ইসলাম), নৈতিক পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা (অর্থাৎ তাকওয়া), এবং আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও অকৃত্রিম নিষ্ঠা (অর্থাৎ ইহসান ইত্যাদি), গুণাবলি ফুটিয়ে তুলেছেন। এরপরই এই নিষ্ঠাবান ঈমানদার লোকদের সংগঠিত চেষ্টা ও সাধানার সাহায্যে প্রাচীন জাহেলী যুগের অস্বাভাবিক ও ক্ষয়িষ্ণু জীবন-ব্যবস্থাকে নির্মূল করে তদস্থলে আল্লাহর বিধানের নৈতিক ও তামাদ্দুনিক মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে এক নির্মল সুষ্ঠু ও সত্যতাপূর্ণ জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এভাবে এসকল লোকই যখন নিজেদের মন, মস্তিষ্ক, নৈতিক চরিত্র, চিন্তাধারা ও কাজ-কর্ম– সব দিক দিয়েই প্রকৃত মুসলিম, মুত্তাকী ও মুহসিন হলো এবং আল্লাহর খাঁটি নিষ্ঠাবান বান্দাহদের প্রকৃতিই যে কর্তব্য পালন করা উচিত তাতে নিযুক্ত হলো। তারপরই বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, কাটছাঁট পোশাক-পরিচ্ছেদ, উঠা-বসা, চলাফিরা এবং এভাবে অন্যান্য বাহ্যিক কাজ-কর্মসমূহের মধ্যে মুত্তাকীদের শোভাবর্ধক ভদ্রতামূলক নিয়মনীতির শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন। অন্য কথায় সর্বপ্রথম তিনি কাঁচা তামাকে উজ্জ্বল বিশুদ্ধ স্বর্ণে পরিণত করেছেন, তারপর তার 'আশরাফী' (আরবিয় স্বর্ণ মুদ্রা) ছাঁচ বা নকশা অঙ্কিত করেছেন।

প্রথমে খাঁটি যোদ্ধা ও বীর সৈনিক তৈরি করেছেন, তারপরই তাকে পোশাক পরতে দিয়েছেন। বস্তুত কুরআন-হাদিসের গভীর ও সূক্ষ্ম অধ্যয়ন করার পর নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, ইসলামী আন্দোলনের এটাই একমাত্র সঠিক

পন্থা– এটাই হচ্ছে এ কাজের পর্যায়মূলক ক্রমিক ধারা। নবী করীম সা. আল্লাহ তা'আলার মর্জি অনুযায়ী যে পন্থায় কাজ করেছিলেন সেই পন্থা অনুসরণকেই যদি 'সুন্নত' পালন মনে করা হয় তবে উক্ত কর্মনীতি অনুযায়ী কাজ করাই সুন্নাত বলতে হবে এবং এ জন্যই লোকদেরকে প্রকৃত মু'মিন, মুসলিম, মুত্তাকী, মুহসিনে পরিণত না করে তাদেরকে মুত্তাকীদের বাহ্যিক পোশাক ও চাল-চলন অনুসারী এবং মুহসীনদের কতোকগুলো প্রসিদ্ধ ও সর্বজনপ্রিয় কাজের অনুসরণকারী বানাতে চেষ্টা করা কোনোক্রমেই 'সুন্নাত' হতে পারে না। শুধু তাই নয়, এটা সুন্নাতের স্পষ্ট বিরোধিতা, 'সুন্নাতের' নামে মনগড়া নীতির প্রচার; তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এটা ঠিক সীসা ও তামা খণ্ডের উপর 'আশরাফীর' নকশা অঙ্কিত করে বাজারে চালাবার অপচেষ্টা এবং নৈতিকতা, নিষ্ঠা, আপত্মোৎসর্গীকৃত মনোভাব সৃষ্টি না করেই নিছক উর্দি পরা কৃত্রিম যোদ্ধাকে যুদ্ধের ময়দানে দাড় করানোর অনুরূপ নির্বুদ্ধিতামূলক কাজ। আমার মতে এটা প্রকাশ্য জাল ও প্রতারণামূলক কৃত্রিমতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। আর বস্তুতপক্ষে এই জাল ও কৃত্রিমতার ফলেই বাজারেও যেমন এই কৃত্রিম মুদ্রার কোনোই মূল্য নেই, যুদ্ধক্ষেত্রেও এই কৃত্রিম ও প্রদর্শনীমূলক নৈতিকতা দ্বারা কোনো কঠিন সংগ্রাম পরিচালনা করাও মাত্রই সম্ভব হচ্ছে না।

বস্তুত আল্লাহর নিকট যে কোন্ বস্তুটির প্রকৃত মূল্য কি হবে তাও চিন্তা করে দেখতে হবে। মনে করুন : এক ব্যক্তির অকৃত্রিম ঈমান আছে, কর্তব্যজ্ঞান আছে, উন্নত নির্মল চরিত্রের গুণে সে গুণান্বিত, আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ রক্ষা করে চলে, আল্লাহর আনুগত্য ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে; কিন্তু বাহ্যিক বেশ-ভূষার দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ এবং বাহ্যিক সভ্যতার মানদণ্ডে পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হতে পারে না। এটাকে খুব বেশি খারাপ বললেও শুধু এতোটুকু বলা যেতে পারে যে, "চাকরটি আসলে ভালো, কিন্তু একটু অসভ্য– এই যা।" তা এই অসভ্যতার দরুন হয়তো সে উচ্চতম মর্যাদা লাভ করতে পারবে না।

কিন্তু শুধু এতোটুকু অপরাধের দরুনই কি তার সকল নিষ্ঠা ও আনুগত্য নিষ্ফল হয়ে যাবে? এবং কেবল উত্তম বেশ-ভূষায় সম্পন্ন না হওয়ার অপরাধেই তার মনিব তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে? এটা কি কোনো মতেই বিশ্বাস করা যায়? মনে করুন : অন্য এক ব্যক্তির কথা, সে সব

সময়ই শরীয়তী পোশাক পরিধান করে থাকে এবং সভ্যতার আচার-অনুষ্ঠান ও আদব-কায়দা যারপরনাই সতর্কতা ও দৃঢ়তার সাথে পালন করে চলে, কিন্তু তার নিষ্ঠা ও আনুগত্যের বিশেষ অভাব রয়েছে, তার কর্তব্যজ্ঞান জাগ্রত নয়, তার ঈমানী মর্যাদাবোধও তেজস্বী নয় এমতাবস্থায় তার এই অভ্যন্তরীণ দোষ-ত্রুটির বর্তমানে আল্লাহর নিকট তার বাহ্যিক বেশ-ভূষার কতোখানি মূল্য হতে পারে। বস্তুত এটা জটিল ও গভীর আইনগত ব্যাপার নয়, যা বোঝার জন্য বড়ো বড়ো কিতাব সন্ধান করে বেড়াতে হবে। প্রত্যেকটি মানুষ নিজেই সাধারণ জ্ঞান দ্বারাই বুঝতে পারে, এ দু'টি জিনিসের মধ্যে প্রকৃত মর্যাদা কোন্‌টার হতে পারে? দুনিয়ার কম বুদ্ধিমান লোকদের মধ্যেও একটা জ্ঞান থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে যে জিনিসটি সম্মান পাওয়ার যোগ্য, আর যেটির সৌন্দর্য মৌলিক নয়– এই দু'টির মধ্যে তারাও পার্থক্য করতে পারে। ভারতের অধুনালুপ্ত ইংরেজ সরকার এই ব্যাপারে একটি চমৎকার উদাহরণ। এরা যে কতো বাবু ও ফ্যাশনপ্রিয় এবং বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের জন্য এরা যে কতো প্রাণ দিয়ে থাকে তা সর্বজনবিদিত, কিন্তু তাদের নিকট প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা কোন জিনিসটি পেয়ে থাকে, তা ভেবে দেখেছেন কি? যে সামরিক কর্মচারী তাদের রাষ্ট্রের বিজয় পতাকা উড্ডীন রাখার জন্য নিজের মন-মস্তিষ্ক ও দেহ-প্রাণের সর্বশক্তি ব্যয় করতো এবং আসল সংকট সময়ে সে জন্য কোনোরূপ আত্মদানে কুণ্ঠিত হতো না, ঠিক তাকেই তারা মর্যাদা দান করতো, উচ্চতম পদে তাকেই অভিষিক্ত করতো। বাহ্য দৃষ্টিতে সে শত অপরিপাটি গোঁয়ার, অমুণ্ডিতশ্মশ্রু বিশিষ্ট, বেকায়দায় পোশাক পরিহিত, পানাহারে অনিয়মিত ও কৃতকার্যে অপটু হোক না কেন, তাতে তার পদোন্নতির কোনোরূপ বাধার সৃষ্টি হতো না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বিলাসপ্রিয়, সভ্যতা এবং সমাজের সর্বজনপ্রিয় রীতিনীতিগুলোর পূর্ণমাত্রায় অনুসরণকারী কিন্তু আনুগত্য ও আত্মোৎসর্গের ব্যাপারে পশ্চাদপদ এবং আসল কাজের সময় নিজের সুযোগ-সুবিধাগুলোর প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য রাখে, ইংরেজগণ তাকে কোনো সম্মানিত পদ দেওয়া তো দূরের কথা, তাকে কোর্ট মার্শাল করতেও দ্বিধাবোধ করতো না। দুনিয়ার সামান্য বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকদের যখন এরূপ অবস্থা তখন আল্লাহ সম্পর্কে কি ধারণা করা যায়? তিনি স্বর্ণ ও তামার পার্থক্য না করে শুধু বাহ্যিক নকশা ছাঁচ দেখে এতে স্বর্ণ মুদ্রার মূল্য দান করবেন? আল্লাহ সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা কি কোনো মতেই সমীচীন হতে পারে?

আমি আবার বলবো, আমার একথা হতে মনে করবেন না যে, আমি মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে চাচ্ছি, কিংবা মানব জীবনের বাহ্যিক দিকসমূহের সংশোধন ও সুষ্ঠুতা বিধানের জন্য প্রবর্তিত বিধি-নিষেধসমূহ পালন করা অপ্রয়োজনীয় প্রমাণ করতে চাচ্ছি– এটা মাত্রই সত্য নয়। আমি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ ও রাসূলের প্রত্যেকটি হুকুমই যথাযথভাবে পালন করা প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিরই অবশ্য কর্তব্য। আর দীন ইসলাম মানুষের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিককেই সুন্দর ও সুষ্ঠু করে গঠন করতে চায়, তাও আমি পূর্ণরূপে স্বীকার করি কিন্তু এটা সত্ত্বেও আমি শুধু একথাই আপনাদের বোঝাতে চেষ্টা করছি যে, মানুষের অভ্যন্তরীণ দিকই মুখ্য ও সংস্কারযোগ্য– বাহ্যিক দিক সেরূপ নয়। প্রথমে মানুষের মূল সত্যের মণিমঞ্জুষা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে হবে তারপর এই অভ্যন্তরীণ দিক অনুসারেই তার বাহ্যিক দিককেও গঠন করতে হবে। আল্লাহর নিকট যেসব গুণের প্রকৃত মূল্য রয়েছে এবং যে গুণাবলির উৎকর্ষ সাধন ও ক্রমবিকাশ দানই ছিলো আম্বিয়ায়ে কেরামের আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য, সর্বপ্রথম সেগুলোর দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে এবং সর্বাগ্রে তা অর্জন করতে হবে। পরন্তু বাহ্যিক দিকের সংস্কার প্রথমত উক্ত গুণাবলির অনিবার্য পরিণামে স্বভাবতই সম্পন্ন হবে, তারপরও কোনো অসম্পূর্ণতা থাকলে ক্রমিক অধ্যায়সমূহ অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই তা পূর্ণতা লাভ করবে, তাতে সন্দেহ নেই।

শারীরিক অসুস্থতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও আমি এই দীর্ঘ বক্তৃতা আপনাদের সামনে পেশ করলাম শুধু এ জন্যই যে, প্রকৃত সত্য কথা পরিপূর্ণতা ও ব্যাপকতার সাথে আপনাদের সামনে সুস্পষ্টরূপে পেশ করে আল্লাহর নিকট আমি সকল দায়িত্ব হতে মুক্তি লাভ করতে চাই। জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই, কার আয়ু কখন শেষ সীমান্তে এসে পৌছবে, তা কেউ জানে না, কেউ বলতেও পারে না। এজন্য সত্যের বাণী পৌছাবার যতোখানি দায়িত্ব আমার উপর রয়েছে, আমি তা যথাযথভাবে পৌছাতে চাই। এখানে কোনো কথা অস্পষ্ট বা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ থেকে গেলে জিজ্ঞেস করে নিন এবং সত্যের বিপরীত কোনো কথা আমি বলে থাকলে আপনারা তার প্রতিবাদ করুন। আর প্রকৃত সত্য কথা যথাযথভাবে আপনাদের নিকট যদি আমি পৌছিয়ে থাকি, তবে আপনারা তার সাক্ষ্য দিন। (সভাস্থল হতে ধ্বনি উঠলো আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমরা সাক্ষ্য

দিচ্ছি) আমার এই দায়িত্ব পালনে আপনারাও সাক্ষী থাকুন, আল্লাহও যেন সাক্ষী থাকেন। আমি দু'আ করছি। আল্লাহ আপনাদেরকে ও আমাকে দীন ইসলামের নিগূঢ় সত্য হৃদয়ঙ্গম করার তাওফীক দিন এবং জ্ঞান অনুযায়ী দীন ইসলামের সমগ্র দাবি পূরণের, তদানুযায়ী জীবন ও যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেওয়ার ক্ষমতাও দান করুন। আমীন।

সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা
- ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা
- তাওহীদ রেসালাত ও আখেরাত
- ইসলামী নেতৃত্ব
- মাতা-পিতা ও সন্তানের হক
- ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
- ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ
- ইসলামী আন্দোলনের অতীত বর্তমান
- কুরআনের আলোকে মু'মিনের জীবন
- কুরআনের মহত্ব ও মর্যাদা
- ইসলামী অনুষ্ঠানের তাৎপর্য
- তাকদীরের হাকীকত
- আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়
- আল্লাহর দুয়ারে ধরণা
- মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য

আধুনিক প্রকাশনী

২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা

১০ আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার
ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা